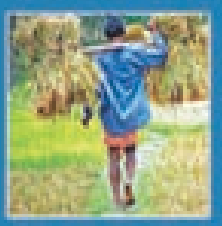

নবান্ন উৎসবে গ্রামবাংলা
—পৃঃ ২১

দাম : দশ টাকা

স্বস্তিকা

ভারতের গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারছে না
—পৃঃ ২৭

৬৮ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা || ২১ ডিসেম্বর ২০১৫ || ৪ পৌষ - ১৪২২ || website : www.eswastika.com

Digital India

ডিজিটাল ইণ্ডিয়া

- ২০১৭-র ডিসেম্বরের মধ্যে দেশের ২.৫ লক্ষ গ্রামে ব্রডব্যান্ড হাইওয়েজ তৈরির পরিকল্পনা।
- দেশের ১.৫ লক্ষ ডাকঘরকে কাজে লাগিয়ে ই-সার্ভিস ডেলিভারির ব্যবস্থা।
- তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৮ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ৪ পৌষ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ

২১ ডিসেম্বর - ২০১৫, যুগাব্দ - ৫১১৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য, সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৯

খোলা চিঠি : কবে হবে রামমন্দির? □ সুন্দর মৌলিক □ ১০

প্রকাশনা সংস্থা, না রিয়েল এস্টেট? □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১১

ডিজিটাল ভারত □ অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৩

ডিজিটাল ইন্ডিয়া— একটি সর্বরোগহর দাওয়াই □ দেবাশিস আইয়ার □ ১৭

অহিংসা পরম ধর্ম— দিব্যজ্ঞানের কথা □ স্বপন নাগ □ ২০

নবান্ন উৎসবে গ্রামবাংলা □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১

গিলাকাঁটিয়ার ‘শিখর’ দেউল □ ড. প্রণব রায় □ ২৩

ভারতের গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারছে না □ স্বপন দাশগুপ্ত □ ২৭

ডালিম জ্যেঠু □ শেখর সেনগুপ্ত □ ২৯

ভারতভূমির জীবনদর্শন □ গুরুপ্রসাদ বিশ্বাস □ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ **নবাঙ্কুর : ২৪-২৫** □ **অঙ্গনা : ২৬** □ **অন্যরকম : ৩৩** □ **সুস্বাস্থ্য: ৩৫** □ **সমাবেশ-সমাচার : ৩৬- ৩৮**□ **রঙ্গম : ৩৯** □ **শব্দরূপ : ৪০** □ **প্রাসঙ্গিকী : ৪২**

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

আই এস মোকাবিলায় বিশ্ব

ইসলামিক স্টেট বা আই এস এখন বিশ্বের ত্রাসসৃষ্টিকারী জঙ্গি সংগঠন। তাদের অতর্কিত আক্রমণে আক্রান্ত ভারত, পাকিস্তান, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, আফ্রিকাসহ বিশ্বের নানা দেশ। সন্ত্রস্ত বিশ্ব তাই আই এস-এর মোকাবিলায় জোট বাঁধতে চাইছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। শুরু হয়েছে আই এস-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ। তবুও থেকে গেছে অনেক 'যদি', 'কিন্তু'। এই নিয়েই এবারের বিষয়। লিখেছেন মেঃ জেঃ কে কে গাঙ্গুলি ও অভিমন্যু গুহ।

স্বস্তিকা

অশোক সিংঘল স্মরণ সংখ্যা

সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন হিন্দু পুনর্জাগরণের পুরোধা ও রামজন্মভূমি আন্দোলনের অগ্রণী পুরুষ অশোক সিংঘল। তাঁর প্রতি স্বস্তিকা-র শ্রদ্ধাঞ্জলি— অশোক সিংঘল স্মরণ সংখ্যা। রঙিন এই সংখ্যাটিতে প্রয়াত সিংঘলের ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে থাকবে আলোচনা। থাকবে সিংঘলজীর জীবনের বেশ কিছু ঘটনার ছবি। সংখ্যাটি সংরক্ষণযোগ্য করা হবে।

প্রকাশিত হচ্ছে ৪ জানুয়ারি, ২০১৬
দাম একই থাকছে ১০ টাকা।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

সম্পাদকীয়

ব্যক্তি স্বার্থে সংসদে অচলাবস্থা সৃষ্টি

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদীয় পরিবেশে রাজনৈতিক সৌহার্দ্য ফিরাইয়া আনিবার উদ্যোগ লইলেও কংগ্রেস সংসদকে অর্থহীন করিয়া তুলিতে চাহিতেছে। কারণ কংগ্রেস বুঝিয়া গিয়াছে তাহাদের মানুষ প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, তাই তাহাদের কথা আর মানুষ বিশ্বাস করিবে না। সুতরাং আলোচনা সমালোচনা পর্যালোচনা না করিয়া সংসদ ভণ্ডুল করিয়া দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। আর এই কারণেই সোনিয়া গান্ধী নিজেকে ইন্দিরা গান্ধীর পুত্রবধূ বলিয়া জাহির করিতেছেন। কারণ ইন্দিরা গান্ধী জরুরি অবস্থা জারি করিয়া দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন আর সোনিয়া গান্ধী ও তাঁহার দল দেশের সংসদীয় ব্যবস্থাটিকেই আজ হত্যা করিতে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছেন। সংসদ ভারতীয় গণতন্ত্রের সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক উচ্চতম মঞ্চ। যে জনমত গণতন্ত্রের বুনিয়াদ, সংসদ তাহারই প্রাতিষ্ঠানিক প্রকাশ। দেশের সমস্ত প্রান্ত হইতে নাগরিকেরা জনপ্রতিনিধিদের সংসদে নির্বাচিত করিয়া পাঠান এই আশায় যে তাঁহারা নিজ নিজ অঞ্চলের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা সমস্যার কথা সংসদে তুলিয়া ধরিবেন এবং সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে নীতি গ্রহণের একটি সার্বিক রূপরেখা তৈরির ক্ষেত্রে সাহায্য করিবেন। বর্তমান আইনগুলির সুবিধা অসুবিধা চর্চিত হইবে, প্রয়োজনে সেইগুলি পরিবর্তিত হইবে কিংবা নতুন আইন প্রবর্তিত হইবে। একদা ইন্দিরা গান্ধী যেরূপ নাগরিকদের সমস্ত অধিকার হরণ করিয়াছিলেন, আজ সোনিয়া গান্ধী এবং তাঁহার দলও সংসদ অচল করিয়া সেইরূপ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমস্ত অধিকার হরণ করিতেছেন। ইন্দিরা গান্ধী যেরূপ সেদিন নিজের ব্যক্তিস্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে দেশের সংবিধানকে পরিবর্তন করিয়াছিলেন, আজও সোনিয়া রাহুল গান্ধী ব্যক্তিস্বার্থে সেইরূপ দেশের আইন পরিবর্তন করিবার কথা বলিতেছেন। আমাদের দেশে সংসদই সর্বোচ্চ আইন নির্ধারক সভাগৃহ, অথচ দলীয় স্বার্থে এবং ব্যক্তিস্বার্থে কংগ্রেস দেশের প্রয়োজনের কথা, দেশবাসীর স্বার্থের কথা ভুলিয়া গিয়া সংসদের কাজকর্ম অচল করিয়া রাখিয়াছে। কংগ্রেস নিত্য নূতন বিষয় লইয়া সংসদ ভণ্ডুল করিবার কৌশল লইয়াছে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর হইতে জনগণের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া তাহাদের এই নতুন খেলা শুরু হইয়াছে। সংসদের গত বর্ষাকালীন অধিবেশন তাহারা ভণ্ডুল করিয়াছে এবং এইবার শীতকালীন অধিবেশনের শুরু হইতেই কংগ্রেস উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে অধিবেশন ভণ্ডুল করিতে। এইবারের কারণ একান্ত ব্যক্তিগত—সোনিয়া-রাহুলের আদালতে হাজিরা দিবার বিষয় লইয়া। কংগ্রেস সংসদে দাবি করিতেছে আদালত যেন তাহাদের হাজির হওয়া থেকে রেহাই দেন। আদালতের রায়কে কেন্দ্র করিয়া সংসদে কংগ্রেসের এই প্রতিক্রিয়ায় দেশবাসী স্তম্ভিত। কংগ্রেস বলিতেছে সরকার প্রতিশোধমূলক রাজনীতি করিতেছে। কিন্তু আদালতের সিদ্ধান্তের সঙ্গে সরকারকে টানিয়া আনিবার পিছনে যে কৌশল তাহা আসলে কংগ্রেসে অসৎ রাজনীতিরই বহিঃপ্রকাশ। দেশে দুর্গতির জন্মদাতা কংগ্রেস দল। তাহাদের রাজত্বে নিত্য নূতন দুর্নীতির জন্ম হইয়াছিল। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' মামলাকে কেন্দ্র করিয়া আদালতের শমন কংগ্রেসের সেই দুর্নীতিকেই মান্যতা দিল। মুম্বইতেও জমি বিতর্কে সোনিয়া ব্রিগেড। মুম্বইতে 'কোয়ামি একতা' পত্রিকা প্রকাশনসংস্থা অ্যাসোসিয়েট জার্নালস লিমিটেডের (এজেএল) নামে বরাদ্দ জমি কংগ্রেস দখল করিয়া কংগ্রেস ভবন নির্মাণ করিতেছে। হরিয়ানায় সোনিয়ার জামাই অন্যের জমি একই কৌশলে আত্মসাৎ করিবার খেলায় মত্ত। 'ন্যাশনাল হেরাল্ড' মামলার নিষ্পত্তি সংসদ করিতে পারিবে না, সরকারও করিতে পারিবে না। এই মামলার নিষ্পত্তি হইবে আদালতে। সোনিয়া এবং রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে, সেই অভিযোগের বিচার করিবার এক্তিয়ার একমাত্র আদালতের। কংগ্রেস আদালতের সামনে তাহাদের যুক্তি তথ্য উপস্থাপন এড়াইয়া যাইতে চায় বলিয়াই সংসদে গোলমাল করিতেছে। আজন্ম কংগ্রেস সেবক মাননীয় রাষ্ট্রপতি এ কারণেই বলতে বাধ্য হইয়াছেন হইচই করিবার অনেক জায়গা রহিয়াছে। কংগ্রেসের এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের শক্তি জুগাইয়াছে বিহার বিধানসভার নির্বাচন। যাঁহারা মনে করিয়াছিলেন বিজেপিকে পরাজিত করিলে গণতন্ত্র মজবুত হইবে তাঁহারা আজ দেখিতেছেন বিজেপির পরাজয়ে দেশের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ সভাগৃহে গণতন্ত্রকেই পদদলিত করা চলিতেছে। দেশের উন্নয়নও ব্যাহত হইতেছে। আগামী দিনে জনগণ যদি ইহার থেকে শিক্ষা না লইতে পারে তাহা হইলে গণতন্ত্রের চরম সঙ্কট উপস্থিত হইবে।

সুভাষিতম্

পরৈঃ পরিভবে প্রাপ্তে বয়ং পঞ্চোত্তরং শতম্।
পরস্পরবিরোধে তু বয়ং পঞ্চ শতং তু তে।। (মহাভারত, বনপর্ব-২৪৩)

অন্যের দ্বারা আক্রান্ত হলে তাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আমরা একশত পাঁচ ভাই। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যুদ্ধের সময় আমরা পাঁচ ভাই আলাদা এবং ওরা একশত ভাই আলাদা।

কেন্দ্রীয় উপকূল রক্ষীবাহিনীর রিপোর্ট

দেশ-বিরোধী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে সুন্দরবনকে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ দেশ-বিরোধীরা সুন্দরবনকে ব্যবহার করছে, এমনই মারাত্মক অভিযোগ আনলো কেন্দ্রীয় উপকূলরক্ষী বাহিনী। ভারতের অন্যান্য প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা এজেন্সিদের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে উপকূলরক্ষী বাহিনীর বক্তব্য— ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুন্দরবনের বাসিন্দাহীন দ্বীপগুলিকে দেশবিরোধীরা তাদের বিশেষ লক্ষ্যে ব্যবহার করছে। গত ১০ ডিসেম্বর দ্বিতীয় বার্ষিক বৃহত্তম গোয়েন্দা সংস্থা সম্মেলন চলাকালীন কেন্দ্রীয় উপকূলরক্ষী বাহিনীর তরফে এই বক্তব্য উঠে আসে। স্বাভাবিকভাবেই এহেন রিপোর্টে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। কারণ দেশের উপকূল রক্ষায় যথেষ্ট দক্ষতা ও বিশ্বাসের পরিচায়ক সংস্থাটির যে কোনো প্রতিবেদনই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখে। উপকূল-রক্ষী বাহিনীর দাবি সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থা ও নদীকেন্দ্রিক

কেন্দ্রীয় উপকূল রক্ষীবাহিনীর প্রহরারত জাহাজ

ব্যবস্থার সুযোগ নিচ্ছে দেশ বিরোধীরা। যে কারণে ওই অঞ্চলের একটি তুলনামূলক মানচিত্রায়ণ ও সমুদ্র পুলিশের নজরদারি ইত্যাদি বাড়াতে আরও সক্রিয় পদক্ষেপের কথাও বলা হয়েছে ওই রিপোর্টে। ভারতের দিকে সুন্দরবনের যে ১০২টি দ্বীপ পড়েছে, তার মধ্যে ৪৮টিই বাসিন্দাহীন। বিভিন্ন অসমাজিক কাজকর্মের জন্য এই দ্বীপগুলিকেই বেছে নিচ্ছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। পাশাপাশি বাংলাদেশের অধীনে থাকা দ্বীপগুলি থেকেও এদের কাছে সাহায্য আসছে বলে অনেকদিন ধরেই অভিযোগ উঠেছে। এই সম্মেলনে ভারতীয় নৌ-সেনা, স্থল-সেনা, উপকূল-রক্ষীবাহিনী ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোয়েন্দা বিভাগ, এন সি বি, এস আই বি, বি এস এফ, এন এস জি এবং উপকূলরক্ষী পুলিশের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। এঁদের আলোচনায় সাম্প্রতিক অতীতে সীমান্ত পার-হওয়া সংক্রান্ত অসংখ্য সমস্যার পাশাপাশি বহু ছিদ্র সীমান্তের কথাও উঠে আসে। যার সুযোগ নিয়ে অনুপ্রবেশ, অস্ত্র-পাচার, অবৈধ জিনিসপত্র পাচার এবং পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে দুষ্কৃতীদের অবাধ গতিবিধির বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। বিষয়টি সামলাতে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলির সঙ্গে রাজ্যের পুলিশ ও গোয়েন্দাদের সংযোগ আরও বাড়ানোর কথা বলা হয়।

সোনার বিস্কুট পাচারে মাঠে নামছে ফিল্ডাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সীমান্তের ওপার থেকে উড়ে আসছে বিস্কুটের প্যাকেট। আর তা কুড়িয়ে নিয়েই ছুট লাগাচ্ছে এপারে থাকা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা। আপাতদৃষ্টিতে এই নিরীহ দৃশ্যটিতে দোষের কিছু না থাকলেও, এ নিয়ে বিএসএফ-এর চিন্তার অন্ত নেই। এনডিএ আমলে সীমান্তে বিএসএফ নজরদারি কঠোর হওয়ায় সোনা পাচারের এক অভিনব কৌশল উদ্ভাবন করেছে পাচারকারীরা। আর এই পাচারের কাজে তারা মাঠে নামাচ্ছে ফিল্ডারদের অর্থাৎ সীমান্তের এপারে ঘুরে বেড়ানো ১০ বছর বয়সী ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের। 'ফিল্ডার' হলো এদের সাংকেতিক নাম। রাতের অন্ধকারে পাচারকারীরা সোনার বিস্কুটের প্যাকেট নিয়ে লুকিয়ে থাকছে সীমান্তের ওপারে--- বাংলাদেশের মাটিতে। এরপর টহলদারির ফাঁকে বিএসএফ জওয়ানরা একটু আড়াল হলেই এপারে (ভারতের দিকে) ঢিল ছোঁড়া হচ্ছে— এ হলো সংকেত। ঢিল পড়ার শব্দেই এপার থেকে দৌড়ে চলে যাচ্ছে ফিল্ডাররা। আর ওই পড়ে থাকা প্যাকেটে মোড়া সোনার বিস্কুট কুড়িয়ে নিয়েই ছুট লাগিয়ে তা এনে তুলে দিচ্ছে এপারে অপেক্ষমান পাচারকারীদের হাতে। বিনিময়ে ওই ক্ষুদে ফিল্ডাররা পাচ্ছে ১০০ টাকা। গত ২৭ অক্টোবর দিনহাটা ২ নং ব্লকের চৌধুরিহাট সীমান্তে টহলদারি চালানোর সময় এই অভিনব কৌশলে সোনা পাচারের ঘটনা প্রথম নজরে আসে বিএসএফ জওয়ানদের।

সম্প্রতি চৌধুরীহাট সীমান্তে যে ১১৬ গ্রাম ওজনের সোনার বিস্কুটটি বিএসএফ জওয়ানরা উদ্ধার করেছে তার বাজারদর প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা। দিনহাটা ২ নং ব্লকের শালমারা থেকে সিতাই পর্যন্ত প্রায় ১৮৮ কিলোমিটার বিস্তৃত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বেশিরভাগ অংশ কাঁটাতারে ঘেরা থাকলেও এলাকায় বহু নদী থাকায় বা কোথাও কোথাও জমি সংক্রান্ত বিবাদ থাকায় সর্বত্র কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া সম্ভব হয়নি। এই সুযোগে পাচারকারীরা বিশেষত বেছে নিচ্ছে এইসব কাঁটাতারহীন এলাকাগুলিকেই। তবে যেখানে কাঁটাতারের বেড়া আছে সেখানে সরাসরি প্যাকেটবন্দী সোনার বিস্কুট ছুঁড়ে দেওয়া হয়। আর যেখানে কাঁটাতারের বেড়া নেই সেখানে ওপার থেকে পাচারকারীরা ঢিল ছুঁড়তেই এপার থেকে ফিল্ডাররা দৌড়ে গিয়ে প্যাকেট নিয়ে এসে এপারের পাচারকারীদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই নতুন পদ্ধতির পাচার আটকাতে বিএসএফ কঠোর নজদারি চালাচ্ছে এবং এই পাচার আটকাতে যথাযথ চেষ্টাও চালানো হচ্ছে।

রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি হলেন দিলীপ ঘোষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি পদে দিলীপ ঘোষ-কে নিযুক্ত করল দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। বিজেপি সভাপতি অমিত শাহ এই ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে রাহুল সিনহাকে কেন্দ্রীয় সম্পাদক পদে নিয়োগ করা হয়েছে। রাজ্য সভাপতি পদে বদলের খবর যখন আসে তখন দিলীপবাবু তমলুকে ছিলেন। খবর পেয়ে তিনি কলকাতায় আসেন। বিজেপি রাজ্য দপ্তরে যখন এসে পৌঁছন তখন সেখানে কয়েক হাজার কর্মী-গুণগ্রাহীদের ভিড়। আবির, ফুল, মিষ্টি দিয়ে তাঁকে সাদরে বরণ করে নেওয়া হয়। দিলীপ ঘোষ বলেন, আমাকে অনেক বড় দায়িত্ব দেওয়া হলো। আশা করি, পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা ভোটে পদ্ম ফোটাতে পারব। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মিলেমিশে কাজ করব।

পশ্চিম মেদিনীপুরের গোপীবল্লভ-পুরের কৃষক পরিবারের সন্তান তিনি। বাল্যকালেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক হন। বিশ বছর বয়সে তিনি সঙ্ঘের প্রচারক হন এবং আসানসোল, দুর্গাপুর, কলকাতা এবং আন্দামান-নিকোবরে সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সংগঠন সম্পাদক ছিলেন। দশ মাস আগে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে বিজেপি-তে আসেন তিনি।

জি এস টি বিলের পক্ষে নামল শিল্প মহল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সংসদে দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা, দেশের অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বহুচর্চিত জিএসটি (পণ্য ও পরিষেবা) বিল পাশ করাতে এবার উঠে পড়ে লাগছে বণিক সমাজ। শিল্প বাণিজ্য ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা এক সংযুক্ত প্রচার শুরু করবেন জিএসটি বিল পাশের পক্ষে। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি, ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, অ্যাসোচ্যাম ও কনফেডারেশন অফ অল ট্রেডার্সের মতো প্রতিনিধিমূলক ব্যবসায়িক সংগঠনগুলি জোটবদ্ধ হয়ে সংসদের এই দীর্ঘসূত্রিতার প্রতিবাদে সোচ্চার হওয়ার কর্মসূচি নিয়েছে। শিল্প বাণিজ্য মহলের মধ্যেই জিএসটি বিল-এর সুফলগুলি নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে এই উদ্যোগ। সংশ্লিষ্টমহল হতাশা ব্যক্ত করে বলেন, সংসদে দেশের বিরোধীপক্ষ এ ধরনের আচরণ করবেন তা তাঁদের বুদ্ধির অগম্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কিন্তু শিল্প বাণিজ্য মহলের পক্ষ থেকে তাঁরা এই আইনের দ্রুত রূপায়ণে বদ্ধপরিকর। ইন্ডাস্ট্রি চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি এই বিল আটকে থাকায় ভারতীয় কর্পোরেট দুনিয়ায় ইতিমধ্যেই যে সংস্থার সম্পর্কে আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে তা জানাতে ভোলেননি।

ওসমানিয়ায় গো-মাংস ভক্ষণে উৎসাহ দিয়ে দেশকে অশান্ত করার ছক বামপন্থীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গোমাংস ভক্ষণ উৎসবকে কেন্দ্র করে দেশকে অশান্ত করতে কোমর বেঁধে নেমেছে সিপিএমের ছাত্র সংগঠন ভারতের ছাত্র ফেডারেশন। সম্প্রতি ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবসে 'গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধ' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সি' হোস্টেল, ত্রিবেণী হোস্টেল, এবং আম্বেদকর হোস্টেলে শতাধিক এস এফ আই সদস্য গোমাংস ভক্ষণের আসর বসালেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সবকিছু জেনেও না জানার ভান করে রইল। যদিও হায়দরাবাদের উচ্চ ন্যায়ালয় রায় দিয়েছিল ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গোরু কিংবা শুয়োর—কোনো মাংস ভক্ষণ উৎসবই পালন করতে দেওয়া যাবে না। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভবত পুলিশ পরে সংশ্লিষ্ট ছাত্রাবাসগুলি তল্লাশি করে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৩০ জন এস এফ আই সদস্যকে

গ্রেপ্তার করে। তবে একইসঙ্গে ভারসাম্য রক্ষায় বিজেপি বিধায়ক টি রাজা সিংকেও আটক করে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি হোস্টেলে এর প্রতিবাদে 'গো-পুজো'র কথা ঘোষণা করেছিলেন। অথচ এই পুলিশই গোমাংস ভক্ষণ উৎসবে বাইরের মানুষকে যোগদান না করতে দেবার অজুহাতে হোস্টেল ঘিরে রেখে গোমাংস ভক্ষণকারীদের একপ্রকার সরকারি সুরক্ষা বলয়ে রীতিমতো নির্বিঘ্নে এই উৎসব পালন সম্পন্নে সাহায্য করে বলে অভিযোগ।

স্বাভাবিকভাবেই এস এফ আই-এর কর্মকাণ্ডকে ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে চাপা উত্তেজনা ও ভীষণ অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্য দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর আবেগকে ধাক্কা দেবার এই বামপন্থী খেলা নতুন নয়। কিছুদিন আগেও কলকাতার রাজপথে সিপিএম নেতা বিকাশ ভট্টাচার্য ও আরেক বামপন্থী (যিনি এখন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে তৃণমূলী হলেও, নিজেকে কমিউনিস্ট বলেই অভিহিত করেন) সুবোধ সরকার প্রকাশ্য রাস্তায় গোমাংস ভক্ষণ করেছিলেন। তারপর সেই ছবি ভাইরালে হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার ছবিও এখন সামাজিক মিডিয়ায় সর্বত্র। ফলত পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তপ্ত হচ্ছে। আর এভাবে দেশের বেকায়দা পরিস্থিতির ফায়দা লোটাই যে কমিউনিস্টদের একমাত্র উদ্দেশ্য ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা সেটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

ক্রমবর্ধমান গ্রীন হাউস প্রভাবের মাঝেও স্থিতিশীল হিমালয়ের হিমবাহ

নিজস্ব প্রতিনিধি।। গ্রীন হাউস গ্যাসের প্রভাবে সুমেরু ও কুমেরু অঞ্চল তথা পর্বতের উচ্চ অক্ষাংশে থাকা হিমবাহ গলনের যে চরম সতর্কবার্তা পরিবেশবিদরা দিয়ে রেখেছিলেন, তার কিছুটা ব্যত্যয় ঘটেছে হিমালয়ের হিমবাহের ক্ষেত্রে। গত ১৪ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় এক লিখিত প্রশ্নের উত্তরে পরিবেশমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকর জানান, যে হিমালয়ের ২,০১৮টি হিমবাহের মধ্যে মাত্র ২৪৮টি বা ১২.৩ শতাংশ জল হয়ে গেলেও প্রায় ৮৬ শতাংশ হিমবাহ স্থিতিশীল। তিনি জানান ২০০৪-২০১১-এর মধ্যে ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন এবং পরিবেশ ও বনমন্ত্রকের মিলিত অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণের ফলে এই তথ্য উঠে এসেছে। গত বছর কারেন্ট সায়েন্স জার্নালে এই খবর প্রকাশিত হয়। এই অনুসন্ধান ক্ষেত্রের মধ্যে কারাকোরাম, হিমাচল, জাঁস্কার, উত্তরাখণ্ড, নেপাল এবং সিকিম অন্তর্ভুক্ত। উপরোক্ত অঞ্চলগুলির মধ্যে ৮৬.৮ শতাংশ হিমবাহই তাদের প্রান্তভাগের দিকে হয় স্থিতিশীল অথবা তাদের সম্মুখভাগে কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হিমবাহের সংখ্যা ও তাদের পশ্চাদপসারণের হারের তুলনা ২০০১-এ সংগঠিত পর্যবেক্ষণের সঙ্গে তুলনা করেই করা হয়েছে। তবে আমেদাবাদ-এর স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার, জিবি পন্থ ইনস্টিটিউট অফ্ হিমালয়ান এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে এক যুগের এই অন্তবর্তী সময় হিমবাহের গতি বোঝার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই অনুসন্ধান দলের এক অন্যতম সদস্য জওহরলাল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ এল রামানাথন জানান যে, এই পর্যবেক্ষণ মূলত রিমোট সেন্সিং ডাটার উপর ভিত্তি করে হয়েছে। তবে হিমালয়ের যে সকল হিমবাহ ভারতের অন্তর্গত, সেগুলির উপর ব্ল্যাক কার্বনের প্রভাব নিয়ে কোনো পর্যবেক্ষণ বা অনুসন্ধান করা হয়নি।

অটলজীর স্বপ্নপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৯৯ সালে প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন অটলবিহারী বাজপেয়ী একবরই মাত্র তাঁর ব্যক্তিগত মনোবাসনার

বটেশ্বরে অটলবিহারী বাজপেয়ীর পৈতৃক বাড়ি

কথা ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল পারিবারিক গ্রাম উত্তরপ্রদেশের বটেশ্বর থেকে আগ্রা শহর পর্যন্ত রেলকে সম্প্রসারিত করা।

সম্প্রতি ভারতীয় রেলের অ্যাডিশানাল ডিভিসনাল ম্যানেজার এস প্রতাপ সিং অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে জানান, আগামী ২৫ ডিসেম্বর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে তাঁর স্বপ্নের রেলপথে প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলা শুরু হবে। এটিই হবে ভারতীয় রেলের পক্ষে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে দেওয়া উপহার। প্রসঙ্গত এই বটেশ্বর গ্রাম থেকেই ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দিয়ে ২৩ দিন কারান্তরালে ছিলেন বাজপেয়ী। সেই সময় আগ্রা থেকে বাটেশ্বর আসা বাজপেয়ীর কথায় ছিল নিন্তান্তই দুর্গম। ১৯৯৯ সাল থেকে নানান বাধা পেরিয়ে ১১টি স্টেশন সম্বলিত এই আগ্রা এটাওয়া রেল পথের খরচ পড়েছে ৪৩০ কোটি টাকা।

মন্দির নিয়ে বিজেপি নয়, বিজেডি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি লোকসভায় বিজেপি সাংসদদের তুমুল সমর্থনের মধ্যে ওড়িশার বিজু জনতা দলের সাংসদ ভর্তৃহরি মহাভব জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে বিশাল সংখ্যক হিন্দু মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন যে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি দেশের অগুনতি ধর্মস্থান ধ্বংস করেছে ও সর্বদা ভারতবিরোধী বিদ্বেষ ছড়ায়— তাদের কেন নিরাপত্তা দেওয়া হচ্ছে।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের উপত্যকায় তাদের উৎখাত বাসস্থানে যাতে তাঁরা পুনর্বাসিত হতে পারেন এই মর্মে বিজেপি-র নিশিকান্ত দুবের আনা এক প্রস্তাবের পক্ষে দাঁড়িয়ে শ্রীমহাতব এই মন্দিরগুলির পুনর্নির্মাণ তালিকায় না থাকার কারণ নিয়ে তাঁর ক্ষোভ গোপন করেননি।

উবাচ

"সরকারের উদ্যোগে স্বচ্ছ ভারত, ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা স্মার্ট সিটির মতো প্রকল্পগুলিতে প্রচুর নতুন বিনিয়োগের সঙ্গে দেশে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিরও আগমন ঘটবে।"

—রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী

কলকাতা চেম্বার অফ কমার্সের ১২ ডিসেম্বর ভাষণে।

"গান্ধী পরিবার চিরকালই কংগ্রেসকে তাদের নিজস্ব জায়গির মনে করে।"

শরদ পাওয়ার

তাঁর সদ্য প্রকাশিত 'ওন মাই টার্মস' বইতে।

"লালবাহাদুর শাস্ত্রী রহস্যময় গুমনামীবাবা সম্পর্কে কৌতূহলী ছিলেন। তাসখণ্ডে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর সঙ্গে এর যোগ থাকা অসম্ভব নয়।"

প্রসিদ্ধ নেতাজী গবেষক অনুজ ধর

৬ মহাদেশের ৮ কন্যা, নৌকায় গোমুখ-ডায়মণ্ড হারবার অভিযানের কথা প্রসঙ্গে।

"আমি রাজনীতি করিনি কেন? এর উত্তর একটাই। রাজনীতি আমাকে কয়েক বছরের মধ্যেই মেরে ফেলতো।"

আজিম প্রেমজী, উইপ্রোর কর্ণধার।

কবে হবে রামমন্দির ?

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা,

আপনাদের মতো আমারও মনের প্রশ্ন, কবে হবে অযোধ্যার জন্মভূমিতে শ্রীরামের ভব্য মন্দির? কবে বাস্তবায়িত হবে ৩৭০ ধারা বিলোপের স্বপ্ন, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি?

নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসা সত্ত্বেও নরেন্দ্র মোদী সরকার কি পারবে না? না, এমন প্রশ্ন মোদী বা বিজেপি অনুগামীদের নয়, এ প্রশ্ন বিরোধীদের। বিশেষ করে কংগ্রেস তথা গান্ধী পরিবারের গোলামি করে আসা মিডিয়ার। তাই একটু সুযোগ পেলেই এই প্রশ্নটা ধরে বিতর্ক তৈরির চেষ্টা শুরু হয়েছে সেই মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই। বলা যায় পরদিন থেকেই। তাই বা কেন? এই প্রশ্ন তো লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই। তখন থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে প্রচারে তিনি বলছেন না কেন রামমন্দিরের কথা?

এই প্রসঙ্গে একটা অতীত কথা মনে পড়ে গেল। কলকাতা প্রেস ক্লাব ভোটের আগে যেমনটা করে থাকে তেমনই সুষমা স্বরাজের সম্মানে মিট দ্য প্রেস ডেকেছিল। সেবার বিজেপির জোটবদ্ধ লড়াই। স্বাভাবিকভবেই কমন মিনিমাম প্রোগ্রাম তথা ভোটের ইস্তাহারে রামমন্দির নেই। এটাই হবে খবর তৈরির ইস্যু। তাই শুরুতেই প্রশ্ন, বিজেপি কি রামমন্দির নির্মাণের ইস্যু থেকে সরে আসছে? কবে হবে রামমন্দির? প্রশ্ন শুনেই এক মুহূর্ত না ভেবে সুষমা স্বরাজ যে উত্তরটা দিয়েছিলেন তা আজও স্পষ্ট মনে আছে। বলেছিলেন, আপনারা সবাই যেভাবে কবে রামমন্দির হবে নিয়ে চিন্তিত তাতে আমি নিশ্চিত আর সময় লাগবে না। আপনাদের সকলের ইচ্ছা একদিন সত্যি হয়ে উঠবে। বিজেপিকে উদ্যোগ নিতে হবে না। সেদিন সবারই মন খারাপ হয়েছিল, কারণ, রামমন্দির ছেড়ে বিজেপি পালাচ্ছে এটা খবর করা গেল না।

এরপর বাজপেয়ী সরকার আসার পর বারবার এসেছে প্রশ্ন। শুধু বিতর্ক তৈরি করার লোকেরাই নয়, রামমন্দিরকে বাস্তবে দেখতে চাওয়া দেশপ্রেমী মানুষেরাও প্রশ্ন তুলেছেন, আর কতদিন? এবার হোক। কিন্তু বাস্তবে ইচ্ছা থাকলেও মিলিজুলি সরকারের প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কিংবা লালকৃষ্ণ আদবানীর মতো প্রবীণ নেতারা সে পথে পা বাড়িয়ে জাতীয় রাজনীতিকে টালমাটাল করতে চাননি। সঙ্ঘের পক্ষ থেকেও সেবার বাস্তবকে উপেক্ষা করে অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ, ৩৭০ ধারা বিলোপ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার মতো বিষয়ে অহেতুক চাপ তৈরি করা হয়নি।

অনেকে বলছেন তখন না হয় মিলিজুলি সরকার ছিল এখন তো নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় বিজেপি তবে সেই মৌলিক ইস্যুগুলি নিয়ে কেন পদক্ষেপ করছে না সরকার? সঙ্ঘের দাবি বিজেপি মানছে না বলে ব্রেকিং নিউজ যারা করছেন তারা আসলে না জানেন সঙ্ঘকে, না জানেন বিজেপিকে। প্রথমত সঙ্ঘ রাজনৈতিক সংগঠন নয় আর তার কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিও নেই। আর বিজেপির কাঁধে ভর দিয়ে সঙ্ঘের শক্তিবৃদ্ধি কিংবা আদর্শ রূপায়ণের কোনো বাসনাই নেই। সাধারণের মধ্যে দেশপ্রেম জাগ্রত করা, সেই দেশপ্রেমকে সংগঠিত করা এবং সেই সংগঠন শক্তি দিয়েই সমাজ বদল সঙ্ঘের আদর্শ। সেখানে বিজেপির কোনো জায়গা নেই।

এবার প্রশ্ন হচ্ছে রামমন্দির নির্মাণ নিয়ে সঙ্ঘের ভাবনা কী? রাতারাতি একটা মন্দির নির্মাণ করা নয়, সঙ্ঘের লক্ষ্য একটি সামাজিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি সাংস্কৃতিক স্মারক নির্মাণ। সেটা গায়ের জোরে হয় না, তার জন্য দরকার জাতীয়তাবাদী চেতনা। আর গণতান্ত্রিক দেশে সেই চেতনার মাধ্যম আইন প্রণয়নই পারে এমন একটি পরিবর্তন আনতে। রাজনীতির কারবারি না হলেও বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের মন্দির ভারতীয় সংসদের প্রতি সঙ্ঘের শ্রদ্ধাও কম নয় তার নিদর্শন ইতিমধ্যেই রেখেছেন এক স্বয়ংসেবক। বিশাল জনসমর্থন নিয়েও প্রথমবার সেই সংসদে প্রবেশের আগে তিনি নতজানু হয়েছেন।

মনে রাখতে হবে, বিনা বাধায় আইন প্রণয়ন করার জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদের সমর্থন প্রয়োজন, যা বিজেপির কাছে এখনও নেই। লোকসভায় তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এই সংখ্যা নেই, রাজ্যসভায় তো সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নেই। সঠিক হিসেব মতো লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ মানে সংখ্যাটা হয় ৩৬২।

এখন নতুন করে এই প্রশ্নটা উঠেছে সম্প্রতি সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের একটি উক্তি। তিনি জীবিতকালে অযোধ্যায় শ্রীরামের ভব্য মন্দির দেখতে চেয়েছেন। না, তিনি দেখতে চেয়েছেন এমন বলটা ভুল হবে কয়েক কোটি ভারতীয়র মনের কথা ব্যক্ত করেছেন তিনি। আর তারই ব্যাখ্যা হয়েছে মোদীর ওপর চাপ বাড়াচ্ছে সঙ্ঘ। প্রিয় পাঠক-পাঠিকা আমার সঙ্গে আপনারাও আশা করি একমত হবেন যে মোহন ভাগবতের এই আর্জি আসলে গোটা দেশের মানুষের কাছে। কারণ, একজন প্রধানমন্ত্রী বা একটা সরকার নয়, তারাই সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ শক্তি তৈরি করে রামমন্দিরের ভিত গড়ে তুলতে পারেন।

— **সুন্দর মৌলিক**

প্রকাশনা সংস্থা, না রিয়েল এস্টেট ?

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

২জি, ৩জি, কয়লা প্রভৃতি নানান কেলেঙ্কারির পর হয়ত এবার বিসমিল্লাতেই টান পড়ল। দেশের উভয় সংসদ তিন দিন অচল, কখনও অংশত। কারণ কংগ্রেস দল ও তার পারিবারিক কর্তাকর্ত্রীর কিছু দুরভিসন্ধিমুলক কার্যকলাপ আদালত প্রাথমিক ভাবে অনুমোদন করেনি। দেশের আইন রক্ষকদের তরফে তাঁদের আদালতে সরেজমিনে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত নিম্ন আদালতে হাজিরা দেওয়া বাতিল করতে সোনিয়া ও রাহুল গান্ধীর আবেদন নাকচ হওয়ার পর তাঁরা চট্‌জলদি দিল্লী উচ্চ আদালতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় আপিল করেন। গত ৭ ডিসেম্বর সেটিও নাকচ হয়। বিষয়টি কিন্তু দেশের আমজনতার ভাল-মন্দের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কখনই জড়িত নয়। অথচ জনতার সংসদ তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থে স্তব্ধ করেছেন।

সকলেই জেনেছেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ১৯৩৭ সালে এজেএল (অ্যাসোসিয়েটেড জার্নাল) নামে আজকের এই বিতর্কিত কোম্পানিটি (এটি কিন্তু পাবলিক কোম্পানি, নাগরিকরা ইচ্ছে করলে এর শেয়ার হোল্ডার হতে পারতেন) কংগ্রেসের তরফে পত্তন হয়। এঁরা তৎকালীন কংগ্রেসের মুখপত্র হিসেবে National Herald ও অন্যান্য পত্র পত্রিকা প্রকাশের শুভ কাজ করত।

এরপর বহু জল গড়িয়ে গেছে। সেই আদর্শভিত্তিক কংগ্রেস দলও নেই। সেই মুখপত্র প্রকাশ করার তাগিদও তারা কালক্রমে হারিয়ে ফেলে। ২০০৮ সালে এজিএল বন্ধ হয়ে যায়। এর পরই আবির্ভূত হয় ত্রাতা কংগ্রেস। যার পরতে পরতে লুকিয়ে থাকা রহস্য আজ উন্মোচিত হচ্ছে।

২০১০ সালে এই কাগজ প্রকাশক কোম্পানিটির সম্পদের অতুল সম্ভাবনার দিকে নজর পড়ে দেশহিতৈষী মাতা-পুত্রের। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ইয়ং ইন্ডিয়ান নামে ২০১০ সালে একটি ঘরোয়া কোম্পানি পত্তন করেন। সোনিয়া ও তাঁর পুত্র পত্তনিদার হিসেবে ৩৮ শতাংশ করে ৭৬ শতাংশে অংশীদার হন। বাকি নগণ্য অংশ বৃদ্ধ জো হুজুর- মোতিলাল ভোরা, একান্ত বশংবদ সমধর্মাবলম্বী অস্কার ফারনানডেজ, সুমন দুবে ও রাজীব সুহৃদ শ্যাম পিত্রোদার নামে বণ্টিত হয়। এই দেশপ্রেমী সংস্থাটি এজিএল কোম্পনির দৈন্যদশা থেকে মুক্তি দিতে তাদের ৯০ কোটি টাকা কংগ্রেস দলের ঋণমুক্ত তহবিল থেকে ঋণ দিয়ে দেয়। মনে রাখতে হবে, এজেএল পাবলিক কোম্পানি হলেও এখানকার পরিচালন সমিতি (বোর্ডে ও চেয়ারম্যান সহ) মাতা-পুত্রের বাছাই করা লোকই বসেছিল। তারা এক বাক্যে ঋণ গ্রহণ করে। কূট অভিসন্ধি মাথা চাড়া দেয়। কংগ্রেস দলের তরফে নাগরিকদের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থ থেকে যে ৯০ কোটি টাকা ঋণ এজেএল-কে দেওয়া হয় তার বিনিময়ে এই ধুঁকতে থাকা কোম্পানিটি তুরন্ত ৯০ কোটি টাকার নতুন শেয়ার ওই ইয়ং ইন্ডিয়ান কোম্পানিকে অ্যালট করে দেয়। যার নিয়ামক অংশীদারি সোনিয়া ও রাহুলের। বাকিরা এলেবেলে। এই সোনিয়া রাহুল পত্তনিদার হওয়া কোম্পানির মূল উদ্দেশ্য এইবার চরিতার্থতার পথ দেখে। পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করা এই এজেএল কোম্পানির মুম্বইয়ের বান্দ্রা এক্সপ্রেস হাইওয়ের উপর ২০০০ কোটি টাকার বা ততোধিক মূল্যের প্রাইম প্রপাটি রয়েছে। সুব্রহ্মনিয়াম স্বামী এই বিষয়টিই আদালাতে চ্যালেঞ্জ করেছেন। ৯০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে একটি মাত্র৫০ লক্ষ টাকা মালিকানার কোম্পানি কী করে একলপ্তে এমন বিপুল সম্পত্তি হাতিয়ে নিতে পারে। প্রসঙ্গত মনে পড়তে পারে প্রেমচন্দ, শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথের বহু উপন্যাস ও গল্পে আগ্রাসী জমিদার বা ভূস্বামীরা তৎকলীন দরিদ্র প্রজাদের অতি নগণ্য অর্থ আপতকালীন ঋণ দিয়ে কীভাবে অনাদায়ে তাদের বহুমূল্য সম্পত্তি আত্মসাৎ করতেন। কিন্তু সেখানে বিষয়টা ছিল নিতান্ত ব্যক্তিগত। এখানে ঋণ নিয়েছে একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। আর সেই সূত্রে খেলাটা জমিয়ে দিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণতম আইনজীবী জনতা আমলে দেশের আইনমন্ত্রী শান্তিভূষণ। তিনি পুরনো ট্রাঙ্ক, তজোরি খুঁজে সেই পরাধীন ভারতে তাঁর বাবার নামে থাকা এজেএল কোম্পানি ৩০০ শেয়ার উদ্ধার করেছেন। সঙ্গে এও জানিয়েছেন সংস্থার আরও অংশীদার অবশ্যই থাকা স্বাভাবিক। সঠিক কথা, মনে রাখা দরকার কোম্পানির আইনের অ আ ক খ-তেই আছে, কোম্পানি থাকলেই তার রেজিস্ট্রার অফ মেম্বারস্ থাকবে। সেখানে সব শেয়ার হোল্ডার-এর নাম নথিবদ্ধ থাকবে। থাকবে কোম্পানির মেমোরানডাম ও অ্যার্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন। ওই সদস্য- তালিকাভুক্তদের কোম্পানি কোনো বিশেষ কাজকর্ম শুরু করলেই বা কোনো বর্তমান শেয়ার হস্তান্তর বা নতুন শেয়ার নতুন কোনো কোম্পানিকে অ্যালট করলে বাধ্যতামূলকভাবে ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন মোতাবেক সকল শেয়ার হোল্ডারকে নোটিশ দিতে হবে। শান্তিভূষণের বয়ান অনুযায়ী কোনো নোটিশ তিনি পাননি। রেজিস্ট্রার অফ মেম্বারদের পূর্ণ পর্যবেক্ষণ তাই ভীষণ জরুরি। তাহলেই এজেএল-এর শেয়ার হোল্ডারদের পূর্ণাঙ্গ তথ্য পাওয়া যাবে। স্বাধীনতার সেই উত্তাল সময়ে তৎকালীন জনপ্রিয়তম দল কংগ্রেসের মুখপত্রের টোকেন মালিকানা পেতে বহু মানুষই যে

অংশ নিয়ে থাকতে পারেন এমনটা ভাবা অমূলক নয়।

এরপর উঠে আসছে আগে বলা কোম্পানির আর্টিকেলস্ অফ অ্যাসোসিয়েশন সংক্রান্ত বিষয়টি। এই সনদ পত্রেই বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করতে হয় সংস্থা কী কী কর্মকাণ্ডের মধ্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবে। তাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক বা দাতব্য কর্মের (যদি থাকে) অভিমুখই বা কী হবে? প্রাথমিকভাবে জওহরলাল নেহরুর প্রিয় National Herald ছাপা ছাড়া অদূর ভবিষ্যতে কোনো রিয়েল স্টেট কোম্পানি খোলার সুপ্ত উদ্দেশ্য কি সেই ১৯৩৭ সালে ভূমিষ্ঠ হওয়া কোম্পানিটির ছিল? কারণ ১৯৮৩ সালে তৎকালীন কংগ্রেসী মহারাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকে সংস্থা অনুসূচিত জনজাতি (এস সি)-দের হোস্টেল করা ও পাঠাগার নির্মাণের উদ্দেশ্যে পূর্বল্লেখিত অত্যন্ত আকর্ষণীয় জায়গায় ৪১৮৬ স্কোয়ারফিট জমি জোগাড় করে। ১৯৮৩ থেকে ২০১৫ এই ৩২ বছরে যে কোনো হোস্টেল বা লাইব্রেরি সেখানে হয়নি তা একটি প্রথম শ্রেণীর মিডিয়া হাউসের তদন্তে জানা গেছে। Bandra Express Highway-র জমিতে এখন বহুমূল্য কমারশিয়াল কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। সংগোপনে রাখা প্রক্রিয়াটি বর্তমান মহারাষ্ট্র সরকারের গোচরে আসায় তারা নির্মাণে স্থগিতাদেশের আইনি পদ্ধতি বিচার করছে। প্রশ্ন জাগে, একটি প্রকাশন সংস্থার পক্ষে এই ধরনের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী কাজ কি সেই সংস্থার অ্যার্টিকেল অফ অ্যাসোশিয়েসন এ অন্তর্ভুক্ত ছিল? যদি না উল্লেখিত থাকে সেক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কাজের ক্ষেত্রে শেয়ার হোল্ডারদের কি জানানো হয়েছিল? এগুলি লক্ষ টাকার প্রশ্ন। কপিল সিবাল যেমন ২জি স্ক্যাম-এ মূর্খের মতো বলেছিলেন, এই দুর্নীতিতে দেশের কোনো আর্থিক ক্ষতি হয়নি, সবটাই notional লস ধরে নেওয়া হচ্ছে। এবারেও তিনি তাই বলেছেন। সবগুলির মালিকই তো কংগ্রেস। না, তিনি সোনিয়া গান্ধীর পদলেহী হওয়ায়, ব্যক্তিগত ভবিষ্যৎ স্বার্থ চরিতার্থ করার আশায় এজিএল-এর সূচনা পর্বের শান্তিভূষণের মতো অপরিচিত, অপ্রকাশিত পরিচয়ের অন্য শেয়ার হোল্ডারদের ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না। ব্যাপারটা তাই মনগড়া বা পিঠ বাঁচানো তথ্যের এক্তিয়ারে নয়। তিনি নিশ্চিত জানেন এটি কোম্পানি আইনের আওতাধীন। মনে রাখা দরকার, কোনো কোম্পানির উৎপাদন বন্ধ হলে তার রাজস্ব উৎপাদন বন্ধ হতে পারে। কিন্তু তার স্থায়ী সম্পদ থেকেই যায়। চারদিকে নজর ফেরালেই দেখা যাবে হাজার হাজার বন্ধ হয়ে যাওয়া বিশালাকার কারখানার জমিগুলি যেনতেন ভাবে গ্রাস করতে মাফিয়াদের বকলমে নেতানেত্রী তাদের আত্মীয় স্বজন যে কোনো কুকর্ম করতে মরিয়া। এগুলি কোম্পানির fixed asset। আইনগতভাবে লিকুইডেশনে গেলে শেয়ার হোল্ডারদের সম্মতি সাপেক্ষে সম্পত্তি নিলামে উঠবে। সংগৃহীত অর্থ থেকে দেনদারদের অর্থ চুকিয়ে বাকি টাকা শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বণ্টিত হবে। এটিই মোটামুটি প্রচলিত পদ্ধতি। তাতে স্থায়ী সম্পদ কংগ্রেস দলের কাছে ফেরত এলে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু ইয়ং ইন্ডিয়ান ও তার নিয়ামক মাতা-পুত্র সর্বগ্রাসী হয়ে দেখা দিয়েছেন। কোম্পানি প্রায় টেক ওভার হয়ে গেছে। আরও মজার কথা, আগে বলা হতদরিদ্র প্রজাদের জমিদাররা অন্তত নিজ অর্থে থেকে ঋণ দিতেন। মাতা-পুত্র পকেটের পয়সা খরচ করেননি; টাকাটা কংগ্রেসের। ''তাঁরা YI নামে বস্তুত রিয়েল এস্টট কোম্পানি খুলে অত্যন্ত চতুরতার মাধ্যমে প্রায় বিলুপ্ত প্রকাশনা সংস্থার মালিকানা শেয়ার হোল্ডিং ৯৯ শতাংশ নিজেদের করায়ত্ত করেছেন'' (অরুণ জেটলি)।

এই অসাধু লেনদেন সম্পর্কে মহামান্য আদালতের আদেশের অংশ অত্যন্ত ভয়াবহ। ন্যায়াধীশরা বলছেন, ''Serious imputations smacking of criminality levelled against petitioners need to be properly looked into.'' আবেদনকারীদের অত্যন্ত গুরুতর অপরাধমূলক কাজকর্মে লিপ্ত থাকায় যে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে তা নিয়ে আরও গভীরে ঢুকে তদন্তের অবকাশ রয়েছে। অথচ হাজিরা, তদন্ত, ফলাফল কোনো কিছু শুরু হওয়ার আগেই সংসদ থেমে গেল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার যুক্তি খাড়া করে।

এর পরও একটু বাকি থেকে যায়। সম্প্রতি নানান সংবাদমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলাটি গত অক্টোবর মাসে আদালতের নিয়ম মোতাবেক বিচারপতি পিএস তেজি'র হাতে আসে। সে সময় কপিল সিবাল যে বর্তমান বিচারপতি (সুনীল গৌর) মামলাটিতে রায়দান করলেন বিচারপতি তেজিকে নিজের হাত থেকে গৌরের হাতে ছেড়ে দেওয়ার মৌখিক অনুরোধ করেন। তাঁদের যুক্তি ছিল গৌর মামলার ২০টি শুনানিতে ছিলেন। বিচারপতি তেজি কোর্টের রোস্টার চেঞ্জের আইন অনুযায়ী মামলা ছাড়তে গররাজি হন। এরপর কংগ্রেসী উকিল লিখিত আবেদন করে বলেন তাঁদের প্রতি আদালত different treatment করছে। এই কারণে তাঁদের মামলা বিচারপতি গৌর-এর বেঞ্চ-এ বদল করা হোক। আদালত তাদের সে সুযোগও দিয়েছে। অন্তিম আবেদনটি কিন্তু সেই সুনীল গৌর অর্থাৎ কংগ্রেসের পচ্ছন্দের বিচারপতির হাতেই নাকচ হয়েছে। কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টে গেলে যে আরও নাস্তানাবুদ হতে পারে তা বুঝে হম্বিতম্বি করে একেবারে মেঠো রাস্তা নিয়েছে। সংসদ অচল করো। রাস্তায় নামো। তবে তাদের জেনে রাখা দরকার, মাতা-পুত্রের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি নিরাপদ রাখতে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি নিখরচায় হড়প করার এ চক্রান্ত ধোপে টিকবে না। আইনি লড়াই দীর্ঘস্থায়ী হবে। সেই দীর্ঘ সময় ধরে দেশের জনগণের নির্বাচিত সংসদ থমকে দেওয়ার এই বেয়াদবি দেশবাসী কিন্তু সহ্য করবে না। তাদের স্নায়ুর চাপ অন্যায়ভাবে বাড়ানো হচ্ছে।

■

ডিজিটাল ভারত

অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

'টিকেট প্লিজ', শব্দে চোখ খোলে জেমস্, সকাল থেকে একটা প্রোগ্রাম মডিউল খুব ভুগিয়েছে। দেরিতে অফিস লিভ, তাড়াহুড়োয় না খাওয়া, লাগাতার ট্রাফিক জ্যাম। ট্রেনটা প্রায় মিস করতে করতে ফটোফিনিশ এন্ট্রি। প্ল্যাটফর্মে নয় নয় করেও ন-দশ জনকে ড্রিবল করার সময় 'ক্যাসিনো রয়্যাল'-এর বিখ্যাত পিছু ধাওয়ার পুনরাবৃত্তি। নেহাত সিট নাম্বার খেয়াল ছিল, তাই একদম জায়গায় বসে হাঁফ ছাড়া। ব্যাগপ্যাকে হেলান দিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে গিয়ে কখন একটু চোখটা লেগে গিয়েছিল, চোখ খুলে সামনেই টিকেট পরীক্ষক। স্বভাসিদ্ধ ভঙ্গীতে পকেটে হাত ঢোকাতেই মাথাটা ঘুরে গেল একচক্কর! সর্বনাশ! তাড়াহুড়োয় ওয়ালেটটা রয়ে গেছে কম্পিউটার টেবিলের ওপরেই। মুহূর্তের আগোছালো ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে বাঁ' পকেটে হাতটা ঢোকায়। যাক্ মোবাইলটা আছে অন্তত। SMS-এর ইনবক্সটা খুলে দেখাতেই চুকলো টিকিটপর্ব। এবার সচিত্র পরিচয়পত্র, তাও ওই মোবাইলের পর্দায় ফুটে উঠল 'ই-লকার' থেকে। বিকেলের রিফ্রেসমেন্ট, রাতের ডিনার, এমনকী পরদিন ব্রেকফাস্ট সবই অনলাইনে বলা ছিল, টিকিট বুকিং-এর সময়ই। পরদিন সকালে স্টেশনে পৌঁছানোর মিনিট দশেক আগেই মোবাইলের স্ক্রিনের ম্যাপে শুরু আর গন্তব্য চিনিয়ে দিতেই ফুটে উঠল গাড়ির নম্বর, ড্রাইভারের নাম। ব্যাগ পিঠে স্টেশন চত্বরে পেরিয়ে বাইরে আসতে না আসতেই প্রতীক্ষমাণ গাড়ির চালক ফোন করে চিনে নিয়ে তুলে নিল জেমস্‌কে।

ফ্লাইওভার থেকে ২০০ মিটার মতো দূরে রাস্তার বাঁদিকে এসে দাঁড়ালো গাড়িটা, মোবাইলে সেইরকমই দিকনির্দেশ ছিল। ভার্চুয়াল মানি ট্রান্সফারের মাধ্যমে ভাড়া মিটে গেছে গাড়ি থামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ছককাটা টাইল্‌সের ফটক পেরিয়ে ব্যাঙ্ক। কিছুক্ষণের মধ্যেই কার্ডলেস ক্যাশ আর মোবাইল ব্যাঙ্কিং-এর মাধ্যমে হাতে পাওয়া গেল টাকা।

ওঃ হো এতক্ষণের তাড়াহুড়োতে পরিচয়টাই করানো হয়নি। না! এই ঘটনার নায়ক জেমস্-'বন্ড' নয় বরং আমার বন্ধু জয়ন্ত। ছোটবেলায় জেমস্ লজেন্স খেতে ভালবাসতো খুব, তাই ওই ডাকনাম। আর ঘটনাস্থল মার্কিন মুলুকের হলিউড নয়, খোদ ভারতবর্ষ। আজকের 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া', Digital India http://www.digitalindia. gov. in/।

তথ্যপ্রযুক্তির কর্মজগতের উদ্ভট ব্যস্ত সমস্ত জীবনে অভ্যস্ত এই জেমস-এর জীবনের শুরুটা ছিল অন্যরকম। গ্রামের ছেলে জয়ন্তর বাবা পোস্টমাস্টার। এখন অবসরপ্রাপ্ত, দাদা হেমন্ত কৃষিকাজে যুক্ত, আর পিঠোপিঠি বোন রেখা হাইস্কুলের ভূগোল দিদিমণি। এখনও ছুটিছাটায় বাড়িতে এলে সন্ধ্যের দিকে বৈঠকখানায় বাড়ির সকলে একজোটে গল্প হয়। বাবা একথা সেকথায় পুরনো দিনে ফিরে যায়। কর্মস্থলে বামপন্থা আর মর্মস্থলে মধ্যপন্থা— এইভাবেই চলতো।

সেই বাবার গলায়ও আক্ষেপের সুর। কম্পিউটারের ব্যবহার ঠেকাতে তখন কিই না করেছি। আজ বুঝি, বড় ভুল হয়ে গেছে। তবু তোদের কাজকর্ম দেখে একটু ভরসা পাই। বোধহয় আমরা এগোচ্ছি। তাই না রে?

কী করে বুঝলে তুমি? আলগোছে প্রশ্নটা রাখে জয়ন্ত। দ্যাখ্, রিটায়ারমেন্টের পর মাসে মাসে যে পেনশন পাই আগে তার জন্য আমাদের লাইফ সার্টিফিকেট তুলতে হোত অফিস থেকে, আবার জমা করতে হোত ব্যাঙ্কে, আর এখন আধার বায়োমেট্রিক সেন্টারে, কম্পিউটারের সামনে বসেই পুরো কাজটা হয়ে যাচ্ছে। কোনো দৌড়ঝাঁপ করতে হচ্ছে না। এতটা যুক্তিপূর্ণ, তথ্য নির্ভর উত্তর বাবার কাছ থেকে সে আশা করেনি। জয়ন্ত বেশ বুঝতে পারে চারপাশের প্রতিটা মানুষের

মধ্যেই বেশ একটা নাড়াচাড়া পড়েছে।

নাগরিক পরিষেবা কেন্দ্র, আধার সম্বলিত বায়োমেট্রিক সেন্টারগুলোতে উপযুক্ত বায়োমেট্রিক সেন্সর যন্ত্র আছে। আর বেশ কিছুদিন হলো শুরু হয়েছে, Jeevan Pramaan :: Life Certificate for Pensioners http://jeevanpramaan.gov.in/ 'জীবন প্রমাণ' পোর্টাল। যার মাধ্যমে উপস্থিত কোনো পেনশন প্রাপকের চোখের গড়ন বা হাতের

ছাপ স্ক্যান করা হয়। এবার তা মিলিয়ে নেওয়া হয় e-Aadhaar by Unique Identification Authority of India https://eaadhaar.uidai.gov.in/ আধার কার্ডের ডেটাবেসে থাকা হাতের ছাপ বা চোখের ছবির সঙ্গে। যা আধার কার্ড তৈরির সময়ই তোলা হয়েছিল। আর মিলে যাওয়া মানেই ব্যক্তি জীবিত, অর্থাৎ জীবনপ্রমাণ। এর ফলে বয়স্ক মানুষদের পাঁচ জায়গায় দৌড়াদৌড়ির কষ্ট, সময় আর অর্থব্যয়— এই সব থেকেই রেহাই মিলেছে।

এরকম অনেকগুলো সরকারি পরিষেবা চালু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু সেগুলোকে নিজের কাজে ব্যবহার করতে যে ন্যূনতম জ্ঞান থাকা দরকার, তা প্রায় অনেকেরই নেই। তবে ঠিকঠাক প্রশিক্ষণ পেলে প্রায় যে কেউই করে ফেলতে পারে কাজগুলো। এই উদ্দেশ্যে শুরু করা হয়েছে, 'রাষ্ট্রীয় ডিজিটাল সাক্ষরতা মিশন', সরকারি ডিজিটাল পরিষেবা যাতে প্রতিটি মানুষ পেতে সক্ষম হয়, এ তারই আয়োজন, পরিবার পিছু অন্তত একজন করে ডিজিটালি সাক্ষর হোক্, আর তথ্যপ্রযুক্তির এই পরিষেবা তার পরিবারের কাজে লাগুক— এটাই মূল লক্ষ্য। সারাদেশে ইতিমধ্যেই ১৭০০-র বেশি ট্রেনিং সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রায় ৩৩ লক্ষ মানুষকে হাতে-কলমে এই প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে, Digital Saksharta Abhiyan, National Digital Literacy Mission http://www.ndlm.in/ ভারতবর্ষ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। আর, গণতন্ত্র মানে জনসাধারণের জন্য, জনসাধারণের মধ্যে এবং অবশ্যই জনসাধারণের দ্বারা। এই তত্ত্ব মাথায় রেখে ভারত সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ। mygov.in. প্রজাতান্ত্রিক দেশে সরকারি যে-কোনো উদ্যোগে জনসাধারণ তার মতামত প্রকাশ করতে পারে এর মাধ্যমে। এমনকী নতুন কী পদক্ষেপ করলে জনস্বার্থে তা আরও বেশি উপযোগী হবে, সেটাও আজ যে কোনো মানুষ অবলীলায় জানাতে পারে। দেশের কোনো অনামী প্রান্তের এক আম আদমি পৌঁছে যেতে পারে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছে। সমাজ তথা দেশের বিভিন্ন কাজে এগিয়ে আসতে পারেন আজ যে কেউ। সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে কোন কাজটি আপনার পছন্দের, তা জানিয়ে দিন এই পোর্টাল্ এর মাধ্যমে। জেনে নিন ঠিক কী আপনাকে করতে হবে আর লেগে পড়ুন সেই কাজে। সকলের এই মিলিত উদ্যোগে সমাজ উপকৃত হবে, আর সেই উপকারের ভাগীদার হবো আমরাও। ইতিমধ্যে সতেরো লক্ষেরও বেশি মানুষ, এক লক্ষেরও বেশি সামাজিক কাজে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এই 'mygov' এর মাধ্যমে। 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ'-এর ফলিত রূপায়ণ mygov.in/

'Digital Locker'-এর সঙ্গে এর পূর্বেই এক ঝলক পরিচয় হয়েছে। এবার কিছুটা বিস্তারিত বলি। 'জন্ম' থেকে শুরু করে 'পড়াশোনা', 'সমাজজীবন' আর 'কর্মজগৎ'-এর হরেক রকম নথি-পরিচয়-প্রমাণপত্র প্রায় প্রতি পদে পদেই আমাদের কাজে লাগে। যে কোনো সরকারি দরখাস্ত হোক কিংবা বেসরকারি পরিষেবা, প্রায় সবক্ষেত্রেই এই প্রয়োজনীয় নথিপত্রের প্রতিলিপি দাখিল করতে হয়। যত্রতত্র, ট্রেনে-বাসে এগুলো নিয়ে চলাফেরা রীতিমতো ঝকমারির ব্যাপার। আর একবার যদি কোনো কারণে দুর্ঘটনাবশত এগুলো হারিয়ে যায়, তাহলেই ব্যস্। আর একথা মাথায় রেখেই এই নতুন পরিষেবা 'Digital Locker'। আধার নম্বরের মাধ্যমে নিখরচায় একটা অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হবে। আর তার মধ্যে upload করতে হবে ওই প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের স্ক্যান করা প্রতিলিপি। তারপর কয়েকটি সহজ ধাপে, নিয়ম অনুযায়ী কিছু পরীক্ষার পর সেগুলো Locker-এ সেভ হবে। এই 'Digital Locker'-এ রেখে দেওয়া নথিগুলি যেমন সুরক্ষিত রইল, তেমনই ব্যবহারের উপযোগী। এরপর থেকে যে কোনো 'অনলাইন ফর্ম বা 'দরখাস্ত' এই অনলাইন ডিজিটাল লকার থেকে শেয়ার করলেই হবে। কাগজপত্র জমা দেওয়ার জন্য এখন তাই পয়সা বা সময় খরচ করে এদিক ওদিক দৌড়ানোর আর দরকার রইল না। সারাদেশে প্রায় দশ লক্ষাধিক মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় নথিপত্র 'ডিজিটাল লকার'-এ সুরক্ষিত করেছে। Digital Locker https://digitallocker.gov.in/

এবার একটু ছাত্রছাত্রীদের কথায় আসা যাক। শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার— মুখে একথা বললেও দেশের প্রতিটি কোণে, সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ছেলেমেয়ে যাতে শিক্ষার আলো পায়, তার সুষ্ঠু ব্যবস্থা বহুকাল ধরেই অসম্পূর্ণ। প্রতিটি ছাত্রছাত্রী তার পাঠক্রম অনুযায়ী বই বা পাঠ্যবস্তু যাতে একদম হাতের নাগালে পেতে পারে, তার জন্য ভারত সরকারের নতুন প্রয়াস-'ই-বস্তা' (E-basta)। পড়াশোনা করার জন্য প্রয়োজনীয় যে-সমস্ত বইপত্র বা Reference Notes লাগে, সেগুলিই দেখতে পাওয়া যাবে

কম্পিউটার বা মোবাইল-এর স্ক্রিনে। ফলত পাঠ্যবস্তুর অভাবে পঠন-পাঠন বিঘ্নিত হবে না। যে সমস্ত বই প্রকাশক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করে, তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের পাঠ্যপুস্তকের বৈদ্যুতিন সংস্করণ এই 'ই-বস্তায়' রাখতে শুরু করেছেন। শিক্ষক শিক্ষিকারাও তাদের পাঠ সহায়িকা ডিজিটালাইজড করে ফেলছেন। একে শিক্ষামূলক 'কনটেন্ট ডেভলপমেন্ট'-ও বলা হয়। তারপর সেই সমস্ত কনটেন্ট 'ই-বস্তা' পোর্টাল-এ রেখে দিতে হবে। আর তাহলেই-দিল্লীর কোনো শিক্ষকের দেওয়া পাঠ পড়তে পারবে হুগলীর কোনো ছাত্রী। এখনও পর্যন্ত এই নতুন 'ই-বস্তায়' যুক্ত হয়েছে প্রায় পাঁচশোরও অধিক পাঠ্যবস্তু। https://www. ebasta.in/

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে যেমন পরীক্ষার কথা উঠে আসে, তেমনই পরীক্ষার সঙ্গে স্কলারশিপ এর যোগও ওতপ্রোতভাবে। বিভিন্ন পাঠক্রমে, পঠনপাঠনেরও বিভিন্ন স্তরে সারাদেশে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রয়েছে বিভিন্ন স্কলারশিপের ব্যবস্থা। যার অধিকাংশই সচরাচর ছাত্রছাত্রীদের জানা থাকে না। আর তাই যোগ্যতা থাকলেও অধরাই থেকে যায় ওই সমস্ত জলপানি। তাই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সঠিক প্রাপকদের মেলবন্ধন ঘটাতে শুরু হয়েছে 'ন্যাশানাল স্কলারশিপ পোর্টাল'--- ছোট করে বললে 'ই-স্কলারশিপ'। এই পোর্টাল-এ ছাত্রছাত্রী এবং প্রতিষ্ঠান উভয়রই লগ্‌ইন-এর ব্যবস্থা আছে। নিজস্ব অ্যাকাউন্ট তৈরির মাধ্যমে নিজ নিজ শিক্ষাগত স্থিতি ও যোগ্যতা পোর্টালে জানাতে হয়। আর তারই মাধ্যমে খবর মেলে কোন কোন স্কলারশিপ পাওয়ার জন্য সে উপযুক্ত, এমনকী উচ্চশিক্ষার জন্য ঋণ এর ব্যবস্থাও রয়েছে এর সঙ্গে। পোর্টাল শুরু হওয়ার পর থেকে এর মধ্যেই প্রায় উনচল্লিশ লক্ষ ছাত্রছাত্রী আধার কার্ডের মাধ্যমে নিবন্ধীকরণ করেছে। এখন Android apps-এও এই সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে মোবাইল থেকে। ebooks platform https://www.scholarships.gov.in/main.do

মোবাইল এর কথাই যখন উঠল তখন 'ই সম্পর্কের' কথা বলতে হয়। ইলেকট্রিসিটি কিংবা টেলিফোন ব্যবস্থা, ব্যাঙ্ক কিংবা বিমা পরিষেবা, ট্রেন থেকে বিমান চলাচল আবার ট্যাক্স কিংবা E.S.I সব ক্ষেত্রেই সময় সময় পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর বা আপডেট এসে যায় মোবাইল- এ। প্রতিনিয়ত এই ধরনের হাজারো খবর আদান প্রদানের ব্যবস্থার নামই 'ই-সম্পর্ক'। eSampark http://www.nic.in./projects/e-jan-sampark-portal

আজ কয়েক কোটি মানুষ তার মোবাইল নম্বর-এর মাধ্যমে এই 'ই-সম্পর্কের' ডাটা বেস-এর সঙ্গে যুক্ত। ভারত সরকারের জনস্বার্থে প্রচারিত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ খবর তাই সাধারণ মানুষ তাঁর মোবাইলেই পেয়ে যাচ্ছে এসএমএস-এর মাধ্যমে। এসএমএস ছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন টোলফ্রি ফোন নাম্বারের সুবিধা। Mobile Seva https://mgov.gov.in/ কৃষি, স্বাস্থ্য কিংবা আবহাওয়ার পূর্বাভাস সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পরামর্শ। আজ যে কোনো সাধারণ মানুষের হাতের নাগালেই। যেমন 18001801104 নম্বর dial করলেই মিলবে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য যার পোশাকি নাম 'National Health Help line। http://www.nhp.gov.in/national-healh-helpline-toll-free-number-1800-180-1104-nhp-voice-web_pg শুধু তথ্য নয় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সহজতর উপলব্ধ করতে তৈরি হয়েছে মোবাইল অ্যাপসও। যার নাম 'ই-হসপিটাল'। প্রাথমিকভাবে এর পরীক্ষামূলক প্রয়োগ চলছে দিল্লীর 'এইমস্ হসপিটাল'-এ। eHospital https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.mgov.ors&hl=en যার সাড়াও মিলছে বেশ ভালো।

কিন্তু এত সবের মধ্যেও খেয়াল রাখতে হবে আমাদের চারপাশে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা বয়স এবং অন্যান্য প্রতিবন্ধকতার কারণে এই প্রযুক্তিগত সুবিধা থেকে কিছুটা হলেও বঞ্চিত। তাই আরও কয়েক কদম এগিয়ে প্রযুক্তির সহজতর প্রয়োগের চেষ্টা করা হচ্ছে কিছু ক্ষেত্রে। যেমন ই-পোস্ট। ভারতীয় ডাকঘরের 'নয়া ডিজিটাল সংযোজন। ধরা যাক শহরে চাকরিরত একটি ছেলে তার হাতের লেখায় গ্রামের বাড়িতে মাকে কিছু জানাতে চায়। ইন্টারনেটের সঙ্গে যুক্ত পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে টাইপ করা কিংবা হাতে লেখা যেকোনো বিষয়বস্তুই ই-পোস্টে দিয়ে দেওয়া যায়। প্রত্যন্ত এক গ্রামের কোণায়— মাটির দাওয়ায় বসে থাকা অশীতিপর এক বৃদ্ধার হাতে সেই ই-পোস্ট কাগজে ছাপা অবস্থায় পৌঁছে যাবে। ভারত সরকারের এই উদ্যোগ তাই মাটিতে পা রেখেই আকাশকে ছোঁয়ার প্রয়াস। http://indiapost.nic.in/

ছোটবেলায় পড়েছিলাম মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধসম। কিন্তু একটা সময় প্রযুক্তির দুনিয়ায় আমাদের সাধের এই মাতৃভাষা ব্রাত্য হতে হতে অপাঙক্তেয় হলো। কিন্তু তারও অনেক পরে দেশ-বিদেশের দামী কোম্পানির নামি প্রযুক্তিবিদদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে বুঝলাম তারা প্রযুক্তিতে এগোলেও মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য করেনি। প্রসঙ্গত, জাপানের কথা ধরা যাক। এমন অনেক প্রযুক্তিবিদ্‌দের দেখেছি, যাদের পারসোনাল কম্পিউটার তাদের নিজস্ব মাতৃভাষাতেই চলে। তাই ভাষা যেমন যোগাযোগের মাধ্যম

তেমনি স্বাভিমান-এর প্রকাশও বটে। আর এরকমই একটা ধারণা থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের অনন্য প্রচেষ্টা (.) ডট ভারত এবং ই-ভাষা। এই গবেষণা আর প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় যোগাযোগের সুযোগ পেয়েছে। কম্পিউটার আর মোবাইলে তথ্য। ভাব আর সংবাদের আদান-প্রদান অনেক সহজতর হয়েছে। এই মাতৃভাষার সুবিধা যুক্ত ব্যবস্থার পোশাকি নাম 'ইন্ডিক ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসার আর ইন্ডিক কী-বোর্ড'। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিলিকন ভ্যালিতে কিছুদিন আগেই ডিজিটাল ইন্ডিয়া সংক্রান্ত একটা আলোচনা সভার আয়োজন হয়েছিল। বিশ্বের সবচেয়ে নামি তথ্য প্রযুক্তির সংস্থাগুলির কর্ণধারেরা সেদিন উপস্থিত ছিল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহ্বানে। গুগ্‌লের সি.ই.ও সুন্দর পিচাই তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে ডিজিটাল ইনফরমেশন টেকনোলজিতে মাতৃভাষা ব্যবহারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তিনি এও বলেন যে, ইন্ডিক ল্যাঙ্গুয়েজে কম্পিউটার আর মোবাইলে যোগাযোগ বা আদান-প্রদানের প্রযুক্তি রূপায়ণে গুগল বদ্ধপরিকর। আনন্দের বিষয় যে, এই কিছুদিনের মধ্যেই সেই প্রচেষ্টা বাস্তবায়িত হয়েছে। bharat or e-bhasa https://www.google.com/inputtools/try/

এতক্ষণ যে এই বিভিন্ন প্রযুক্তিগত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা হলো তার পুরোপুরি সুফল পেতে গেলে দু'টি আবশ্যিক চাহিদা পূরণ করতে হবে। প্রথমত, সঠিক ডিজিটাল পরিকাঠামো। দ্বিতীয়ত, ইনফরমেশন হাইওয়ে বা ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট। প্রযুক্তিগত পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে আই আই টি সহ বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলি এক জোটে কাজ করছে। আর বেশ কিছু বেসরকারি শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে নিয়ে 'ন্যাশনাল অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক' প্রতিনিয়ত চেষ্টা চালাচ্ছেন ব্রডব্যান্ড পরিষেবাকে দেশের সর্বত্র পৌঁছে দিতে। দেশ-বিদেশের প্রযুক্তির মেলবন্ধনে উন্নতির পথে এগোচ্ছে আমাদের দেশ। এরই নাম 'ই-ক্রান্তি'।

প্রযুক্তির ব্যবহার শুধুমাত্র উচ্চবিত্তদের নাগালের মধ্যে— এই সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে হলে প্রযুক্তিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশগুলোর দামও কমিয়ে আনতে হবে। আর তাই দেশীয় পরিকাঠামো আর কলকারখানা দরকার। এই উদ্যোগের নাম 'মেক ইন ইন্ডিয়া'। এই যে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার নানাবিধ কার্যক্রম, এর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আর দেশ মানে এর অধিবাসী। ভারতবাসী আরও স্বয়ংসম্পূর্ণ হোক, এই লক্ষ্যেই নতুন মডেল জে এ এম— (১) প্রধানমন্ত্রী (J) জনধন যোজনা— যা ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে পৌঁছে দিয়েছে সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে। আজ ১৯ কোটিরও বেশি মানুষকে ব্যাঙ্ক পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত করেছে 'জনধন'। Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana http://www.pmjdy. uidai.gov.in/ যা গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে স্থান করে নিয়েছে স্বমহিমায়। (২) (A) আধার কার্ড জনে জনে ডিজিটাল পরিষেবা পৌঁছোনোর জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন প্রত্যেকের ডিজিটাল পরিচিতি, যা আধার কার্ড তৈরির মাধ্যমেই সম্ভব। আর (৩) (M) মোবাইল— এমন একটা মাধ্যম থাকা দরকার, যাতে ডিজিটালি সংযুক্ত করা যাবে সকলকে। আর তাই-ই দরকার মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থা। ব্যাস, এই তিনটে হলেই যে কোনো ভারতবাসীর ডিজিটাল বিশ্বে স্বাগতম।

নতুন নতুন ভাবনা চিন্তা, পরামর্শ, যুক্তি-তর্ক, প্রযুক্তির দেওয়া নেওয়া আর আপামর দেশবাসীর প্রত্যক্ষ যোগদানে ডিজিটাল বিশ্বে ভারত আজ উল্লেখযোগ্য স্থান অর্জন করেছে প্রতিনিয়ত ছোটো বড়ো আবিষ্কার, প্রয়াস আর পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণের সহায়তায় প্রযুক্তিকে সরল আর ব্যবহার উপযোগী করে তোলা হচ্ছে। ভারতীয় গণতন্ত্রে 'শাসনব্যবস্থা' হোক জনস্বার্থের পক্ষে আদর্শনিষ্ঠ আর স্বচ্ছ- নিষ্কলঙ্ক ডিজিটাল ইন্ডিয়ার এটাই লক্ষ্য। সম্মিলিত ভাবে একেই বলে ই গভর্নেন্স National e-Governance Plan: Home http://www.negp.gov.in/ ডিজিটাল ইন্ডিয়া কোনো তাৎক্ষণিক চটক নয়। এর চিন্তা-ভাবনা-ধারণা-প্রকল্প-রূপায়ণ-ফল সুদূরপ্রসারী।

কর্মস্থল দিল্লী হোক বা গাঁয়ের বাড়ি দয়ালপুর 'ডিজিটাল ইন্ডিয়া'র তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র। রোজ বেশ খানিকটা করে গড়ে উঠছে, বেড়ে উঠছে এই নির্মীয়মান বাস্তবতা।

(লেখক ওয়েবেল ইনফরমেটিকস্-এর সিস্টেম ডেভেলপার এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন-সংযোগ বিভাগের অতিথি অধ্যাপক)

ডিজিটাল ইন্ডিয়া—একটি সর্বরোগহর দাওয়াই

দেবাশিস আইয়ার

বিশ্বের তাবড় অর্থনীতিবিদদের মতে ভারতের সবথেকে বড় সমস্যা দুর্নীতি, বেকারত্ব ও গরিবি। কিন্তু মোকাবিলা করা যাবে কীভাবে। বিশ্ব ইতিহাস এই জাতীয় সমস্যার মোকাবিলায় যে দাওয়াইটির ওপর সব থেকে বিশ্বাস রাখে তা হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার। যুগে যুগে যার হাত ধরে এগিয়েছে আমাদের সভ্যতা তথা সিভিলাইজেশন। আর এই সিভিলাইজেশনেরই সর্বাধুনিক রূপ হলো ডিজিটালাইজেশন।

অর্থনীতির মূল তিন ক্ষেত্র হলো কৃষি, শিল্প ও পরিষেবা। এই তিন ক্ষেত্রের মিলন ঘটানোর কাজটি যার মাধ্যমে করা সম্ভব হচ্ছে তারই প্রথাগত নাম ডিজিটালাইজেশন। কম্পিউটার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমস্ত তথ্য ও নথির ডিজিটাল প্রতিলিপি তৈরি, রক্ষণ ও ব্যবহারের কাজই হলো ডিজিটালাইজেশন। আর ডিজিটাল ইন্ডিয়া হলো সেই লক্ষ্য যখন ভারতের যে কোনো মানুষ দূর প্রান্তে থেকেও তার হাতের ছোট্ট যন্ত্র (মোবাইল)-কে কাজে লাগিয়ে লেনদেন করতে পারবে। মাঝরাতে জরুরি প্রয়োজনে জেনে নিতে পারবে ভারতের কোন ব্লাড ব্যাঙ্কে তার গ্রুপের রক্ত পাওয়া যাবে। আনিয়ে নিতে পারবে প্রয়োজনীয় কোনো ওষুধ বা দরকারি জিনিস। নিজের সন্তানের উদ্ভট প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য আর হাতড়াতে হবে না। আঙুল বুলিয়ে বাড়িতে বসেই জেনে নিতে পারবে ভারত তথা বিশ্বের কোন লাইব্রেরিতে এই বিষয়ের বই আছে। সংসারের চাপে বেশি দূর পড়তে না পারা ছেলেমেয়ে বাড়ি বসেই অল্প আয়াসে করে নিতে পারবে পছন্দসই কোনো ডিগ্রী। আর এই অভূতপূর্ব ডিজিটাল বিপ্লবের জন্য প্রাথমিক ভাবে সরকারের তরফে সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে ২০১৮।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া তৈরির কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার প্রাথমিক ভাবে যে তিনটি লক্ষ্য সামনে রেখেছে সেগুলি হলো—

১. সারাদেশে ডিজিটাল প্রযুক্তির জাল বিস্তার করা।

২. জনসাধারণকে ডিজিটাল দুনিয়ার উপযোগী করে তোলা এবং সমস্ত ডিজিটাল রিসোর্সের সহজ পাওয়ার ব্যবস্থা করা।

৩. সরকারি সমস্ত কাজকে ডিজিটালাইজ করে এর মধ্যের দীর্ঘসূত্রিতা ও দুর্নীতির পরিমাণ কমানো।

এই ডিজিটাল ইন্ডিয়া তৈরির ভাবনা যে ১০টা স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তা হলো—

(ক) সারাদেশের প্রতিটি কোনায় ব্রডব্যান্ড কানেকশান-এর জাল বিস্তার করে একেবারে ব্রডব্যান্ড হাইওয়েজ তৈরি করা।

(খ) প্রত্যেকের হাতে স্মার্ট-ফোন পৌঁছে দেওয়া।

(গ) জনগণকে ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারে শিক্ষিত করে তোলা।

(ঘ) ই-গভর্নেন্স এ সবাইকে অভ্যস্ত করানো।

(ঙ) ই-ক্রান্তি তথা সরকারি সমস্ত পরিষেবা অনলাইন করে দেওয়া। কৃষি ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির উপযুক্ত ব্যবহার করে প্রোগ্রাম বানানো।

(চ) আর্লি হারভেস্ট প্রোগ্রাম--- প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু ডিপার্টমেন্টে পরীক্ষামূলক ভাবে ই-সার্ভিস চালু করে পাবলিককে এতে অভ্যস্ত করানো। সম্প্রতি এরকম পরিষেবার ভালো দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া গেছে রেল বিভাগের ই-সার্ভিস পোর্টালে। সংবাদে প্রকাশ, চলন্ত ট্রেনে শ্লীলতাহানির শিকার হয়ে মোবাইলের মাধ্যমে টুইট করে সঙ্গে সঙ্গে উপকার পেয়েছে এক মহিলা যাত্রী।

(ছ) তথ্যভাণ্ডার সবার জন্য উপলব্ধ করা।

(জ) তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রকে কাজে লাগিয়ে প্রচুর চাকরির ব্যবস্থা করা।

(ঝ) ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য উৎপাদনে ভারতকে স্বনির্ভর করা।

(ঞ) বিশ্ব মাপের ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানি তথা কনগ্লোমারেট তৈরি করা।

এর প্রাথমিক উদ্যোগ হিসাবে ভারত সরকারের তরফে Bharat Broadband Network Limited (BBNL) সারাদেশ জুড়ে National Optical Fibre Network (NOFN)-এর লাইন পাতার কাজ শুরু করেছে। ২০১৭-র ডিসেম্বরের মধ্যে সারাদেশের ২.৫ লক্ষ গ্রামে এই ব্রডব্যান্ড হাইওয়েজ তৈরির কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। প্রথাগত ভাবে ১ জুলাই ২০১৫ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরে প্রকল্পটি কাজ করা শুরু করেছে। মোদীর ব্রেন-চাইল্ড এই প্রকল্পকে সফল করার জন্য বিশ্বের তাবড় কোম্পানি এতে বিনিয়োগ করতে শুরু করেছে বা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। রিলায়েন্স ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে 'জিও ডিজিটাল ইন্ডিয়া স্টার্ট-আপ ফান্ড' তৈরি করেছে। তারা জানিয়েছে আগামী কয়েক বছরে এই ফিল্ডে তারা ৫ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করবে। ই-হেল্‌থ ও ই-এডুকেশনের জন্য ১ লক্ষ কোটি বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে ভারতী এয়ারটেল। গুগল জানিয়েছে তারা খুব শিগগিরি ৫০০ রেলস্টেশনকে ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি-র নিয়ন্ত্রণে আনবে। মাইক্রোসফ্‌ট ৫ লক্ষ গ্রামে ব্রডব্যান্ড কানেকটিভিটি করে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। ওরাকেল জানিয়েছে তারা কেন্দ্র সরকারের স্মার্ট-সিটি প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে।

ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্প সফল হলে আমরা যে যে সুবিধা নিতে পারব সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ—

১. **ই-সার্ভিস ডেলিভারি**—সারাদেশের ১.৫ লক্ষ পোস্ট অফিসকে কাজে লাগিয়ে ই-সার্ভিস ডেলিভারি পয়েন্ট তৈরি করা হবে। যেখান থেকে কোনো মানুষ ই-মেল থেকে ই-অ্যাপ্লিকেশন, ই-পার্সেল প্রভৃতি কাজ সহজে করতে পারবে। যে কাজটা এখন বেসরকারি উদ্যোগে সাইবার ক্যাফগুলো করে তাই ব্যাপক ভাবে পোস্ট অফিসগুলোকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যন্ত গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য, যে নেট পরিষেবাকে কাজে লাগিয়ে আজ শহুরে মানুষ খুব সহজে বিপুল তথ্য ভাণ্ডারের নাগাল পাচ্ছে তাকেই প্রত্যন্ত গ্রামের পড়ুয়াদের জন্য সহজভাবে উপলব্ধ করা। আজ যদি বার্থ সার্টিফিকেট থেকে পাসপোর্ট প্রভৃতি সমস্ত আবেদন অনলাইনের মাধ্যমে করার ব্যবস্থা হয় তবে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের দক্ষতা সহজে বোঝা যাবে। জানা যাবে কোন দপ্তর কোন কাজ করতে কতদিন সময় নেওয়ার জায়গায় কতদিন সময় নিচ্ছে।

২. **পাবলিক গ্রিভেন্স রিভেসাল**—ইতিমধ্যে আমরা অনেকেই সিবিআই এর পক্ষে একটি মেসেজ পেয়েছি যাতে লেখা আছে— if any central govt. employee demands money for any official work, please complain to CBI, ACB, Kolkata on 09051613440 /03322894408 .

অর্থাৎ এবার সরকারি অফিসে ঘুষের তানাশাহি বা লাল ফিতের বাঁধনের গড়িমসী মিটতে চলেছে। সরকারের সঙ্গে জনসাধারণ যাতে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারে তার জন্য কেন্দ্রের তরফে খোলা হয়েছে বেশ কিছু পোর্টাল। যেমন—

https://mygov.in/
http://deity.gov.in/
http://www.digitalindia.gov.in/
http://www.digitalindiaprojects.net/
http://www.cmai.asia/digitalindia/

৩. **ইলেকট্রনিক ডেটাবেস এবং ডিজিটাল লাইব্রেরি**— সারাদেশের সমস্ত তথ্যভাণ্ডারকে ক্লাউড এর মাধ্যমে অনলাইনে যোগানের ব্যবস্থা করা হবে। সমস্ত প্রয়োজনীয় সরকারি তথ্য তথা খবর এবং সমস্ত লাইব্রেরি বা মিউজিয়ামে রক্ষিত নথি-পুস্তকের ডিজিটাল ভার্সান করে সেগুলিকে অনলাইনে উপলব্ধ করানোর ব্যবস্থা করা।

৪. **মোবাইল এমার্জেন্সি সার্ভিস**— বিশেষ বিশেষ চাহিদা নির্ভর মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করে সেগুলির মাধ্যমে ই-লার্নিং, স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, অনলাইন মেডিক্যাল কনসালটেশন, ই-কোর্ট, ই-পেমেন্ট ('প্লাস্টিক মানি' ব্যবহার করে) প্রভৃতি সমস্ত পরিষেবার ডিজিটাল ভার্সান উপলব্ধ করানো। E-power থেকে M-power-এ উত্তোরণ।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে, ডিজিটাল ইন্ডিয়া প্রকল্পে একাধারে আমরা যেমন বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আধুনিক হব, তেমনি কম্পিউটার নির্ভর পরিষেবাকে কেন্দ্র করে লক্ষ লক্ষ বেকারের চাকরি হবে, বেকারত্বের সঙ্গে সঙ্গে দূর হবে দারিদ্র্য। মিটবে সরকারি অফিসের ঘুষ নেওয়া সংস্কৃতি। দূর হবে দুর্নীতির দুষ্ট চক্র।

(তথ্যসহায়তা অরিন্দম কোনার)

জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

চিঠিপত্র

অসহিষ্ণুতা

এখন ভাবলে প্রায়শই অবাক লাগে যে, ভারতবর্ষের প্রতিটি ক্ষেত্রে তথা মজ্জায় সনাতন হিন্দুধর্মের সংস্কার বিদ্যমান, যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশবাসী হিন্দু ধর্মের, সেই দেশেরই হিন্দু ধর্মের ব্যক্তিরা তাদের নিজ ধর্মের কথা বললে নিন্দিত হচ্ছেন 'সাম্প্রদায়িক' তক্‌মার সঙ্গে— এ বোধহয় হিন্দু ধর্মের সহিষ্ণুতা বা উদারতার পরিচায়ক আর নয়, বরং একটু বেশিই আত্মবিস্মৃত স্বধর্মের প্রতি। অতি সাম্প্রতিক সময়ে ধর্মতলার বুকে প্রকাশ্যে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা গোমাংস ভক্ষণে উদ্যত হলেন। শুধু তাই নয়, তারা একটি অংশের (যাদের মধ্যে জন্মগতভাবে অধিকাংশই হিন্দু) দ্বারা সমর্থিত হলেন খাদ্যের স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা গোমাতার পূজা করেন সর্বত্র ভগবতী রূপে, অথচ কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমান শূকরকে পূজা করেন না, এমনকী তার সামনে নামাজও পড়েন না। তাই যে সব সৃজনশীল মানুষরা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ হিসাবে জাহির করে জনসমক্ষে গোমাংস খেলেন তারা কি তবে বাস্তবিকই হিন্দু ধর্মপ্রাণদের ভাবাবেগকে আঘাত করতেই এ কাজ করলেন? কেননা যদি তাদের ব্যাখ্যানুসারেও তারা ধর্মনিরপেক্ষ হয়েও থাকেন তাহলে ওই একই জায়গায় একই সময়ে একসঙ্গে গোমাংস এবং শূকরের মাংস খেয়ে উদ্‌যাপন করা উচিত ছিল। যেহেতু তারা সেটি করেননি বা করতে সাহস দেখাতে পারেননি, তাই তাদেরকে 'হিন্দু বিদ্বেষী' বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হবার কোনো কারণ নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমার ভাবলে খুবই খারাপ লাগে যে, জন্মগত হিন্দুদের কয়েকজনই এই ধরনের কাজে প্ররোচিত হচ্ছেন, সক্রিয় হচ্ছেন, আবার সবকিছুর শেষে সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী আওড়ে সাময়িক হাস্যকর প্রশংসা কুড়োচ্ছেন। হয়তো ধর্মনিরপেক্ষতা কী এঁরা সেটাই অনুধাবনে অক্ষম। এসবের প্রেক্ষাপটে অনেকেই সচেতনভাবে ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার কথা বলে ঘোলা জলে মাছ ধরতে চেষ্টা করছেন। হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা হলেন সমগ্র বিশ্বের নিরিখে সবচেয়ে বেশি ধর্মীয়ভাবে সহিষ্ণু তথা উদার, আর তাদেরকেই সহিষ্ণুতা শিখতে হবে অন্যদের কাছ থেকে? আসলে কোনো সমালোচনাই গঠনমূলকভাবে হচ্ছে না, হচ্ছে শুধুমাত্র কিছু রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কর্মসূচি।

—অত্রি মল্লিক,
বর্ধমান।

গো-হত্যা রদ

গাভীকে হিন্দুগণ পবিত্র প্রাণী হিসেবে গণ্য ও পালন করে। ধর্মীয় অনুভূতি ছাড়াও অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি অনেক দিক দিয়ে গো-রক্ষা করা আমাদের একান্ত কর্তব্য।

ইসলাম ধর্মে তথা কোরাণে মুসলমানদের জন্য কোরবানি করার উল্লেখ আছে। ইদুজ্জোহার সময় যন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতিতে জবাই দ্বারা মুসলমানদের পশু হত্যার নাম 'কোরবানি'। সেই পশু উঠ, দুম্বা, ভেড়া, গোরু, ছাগ ইত্যাদি হতে পারে। কোরবানি করাটাই ধর্মীয় অঙ্গ, গোরু কোরবানি করাটা বাধ্যতামূলক নয়। সুতরাং গো-হত্যা বন্ধ করাটা ইসলাম ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করা নয়। কোরবানি বন্ধ করার কথাতো কেউ বলছে না। অথচ হিন্দু মৌলবাদী মুসলমান বিদ্বেষ বশতই হিন্দুদের ধর্মীয় অনুভূতিকে আঘাত করতে তাদের নাকের ডগায় গো-হত্যা করতে খুবই উৎসাহী। গো-হত্যা বন্ধ করার কল্যাণমূলক কাজকে 'সাম্প্রদায়িকতা' অসহিষ্ণুতা ইত্যাদি মিথ্যা আখ্যা দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে কিছু লোক যে মাতামাতি করছে তারা প্রায় সকলেই মতলববাজ এবং কেউ কেউ আহাম্মক। মতলববাজদের লক্ষ্য দেশের সাম্প্রদায়িক সুস্থিতি নষ্ট করে দেশে সমস্যার সৃষ্টি করা এবং ভারতকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হেয় প্রতিপন্ন করা। এটা অবশ্যই অন্তর্ঘাতমূলক কাজ, যা রাষ্ট্রদ্রোহ। এর বিচার হওয়া প্রয়োজন।

—কমলাকান্ত বণিক,
দত্তপুকুর, উত্তর ২৪ পরগনা।

হাওড়ার রাজীবপুরের দুর্গাপুজো

হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার প্রত্যন্ত গ্রাম রাজীবপুরে ৮৩ বৎসর ধরে সর্বজনীন শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে কার্তিকী অমাবস্যায়। এই শ্যামাপূজার সূচনা করেছিলেন বিষ্ণুপদ দে, বিজয় পালিত, গৌরচন্দ্র সামন্ত এবং আরো কয়েকজন উৎসাহী কিশোরেরা ১৯৩২ সালে। কেবলমাত্র ভয়ঙ্কর বন্যার জন্য ১৯৭৮ সালে দুর্গাপূজা হয়নি। অর্থনৈতিক মানদণ্ডে নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র জনসংখ্যা অধ্যুষিত কৃষিভিত্তিক রাজীবপুরে প্রতিবৎসর অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে কিন্তু গ্রামবাসীদের আন্তরিক উৎসাহ ও অংশগ্রহণে সর্বজনীন দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে রাজীবপুর অগ্রণী পাঠাগার প্রাঙ্গণে। কিন্তু এই বৎসর হঠাৎ কোনো কারণে গ্রামের তরুণ-যুবকরা পূজা করার বিষয়ে খুব একটা উদ্যোগী হতে পারেনি। তাই বহু বৎসরের ঐতিহ্যবাহী সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও শ্যামাপূজা প্রায় বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে গ্রামবাসীদের অবাক করে দিয়ে আসরে নামলেন কয়েকজন সাধারণ গৃহবধূ। এঁরা কেউউ দুর্গাবাহিনীর নাম শোনেননি। কিন্তু দুর্গাবাহিনীর আদর্শ অনুসরণ করে বহু বছর ধরে চলে আসা দুর্গাপূজা ও কালীপূজা করার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন— দীপালি সাঁতরা, সুপ্রিয়া সাঁতরা, বন্দনা প্রামাণিক, মানসী প্রামাণিক, মেনকা জানা, মীরা খাঁড়া, কবিতা প্রামাণিক, বুলটি বেরা, মঞ্জু সাঁতরা, কাকলি সাঁতরা, নীলিমা সাঁতরা এবং আরো অনেকে। এঁরা উদ্যোগী হয়ে মহিলা পূজা কমিটি তৈরি করে গ্রামবাসীদের দ্বারে দ্বারে পূজার জন্য সাহায্য চাইতে গেলেন— গ্রামবাসীরাও অভিনব পূজা কমিটির সদস্যাদের নিরাশ করেননি। আনন্দের সঙ্গে সামর্থ্যমতো পূজার জন্য চাঁদা দিয়েছেন। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত পুজো যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় সেইজন্য কিছু গ্রামবাসী ব্যক্তিগতভাবেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবছর রাজীবপুর গ্রামে সর্বজনীন দুর্গাপূজা ও কালীপূজা সুসম্পন্নভাবে অনুষ্ঠিত হলো কেবল এই উদ্যোগী সবলা মহিলাদের জন্য— যাঁরা পুজো পরিচালনার বিষয়ে এতদিন অবলা ছিলেন।

—সমিত দে,
রাজীবপুর, হাওড়া।

অহিংসা পরম ধর্ম—দিব্যজ্ঞানের কথা

স্বপন নাগ

'অহিংসা পরম ধর্ম' এটা দিব্যজ্ঞানের কথা। এটা শুধুমাত্র দার্শনিকদের জন্য আর কিছু দুর্বল লোকেদের জন্য। সাধারণ মানুষ বা প্রশাসকদের জন্য নয়। তারা সকলেই কাণ্ডজ্ঞানের অধিকারী।

সখী অহিংসা কাহারে কয়? সে কি কেবলই যাতনাময়? আচ্ছা মশা কামড়ালে সেই মশাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে কামড়ানো থেকে বিরত করার নাম কি অহিংসা? কিংবা আমার যাত্রাদলে সখী সাজা পিসেমশায়ের বনের মধ্যে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য বাঘকে, ছিঃ বাঘ তুমি না ল্যাংটো বলে তিরস্কার করে বাঘকে লজ্জায় ফেলে দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করাতে বাধ্য করার নাম অহিংসা?

হিংসা কারে বলে তা জানি। কোনো মানুষ বা প্রাণী অন্য কোনো মানুষ বা প্রাণীকে মারলে, রক্তপাত ঘটালে বা হত্যা করলে তাকে হিংসা বলা হয়। অহিংসা কি এর উল্টোটা? সবল প্রাণী বাঘ, সিংহ দুর্বল প্রাণী গোরু, ছাগলকে হত্যা করে এবং খায়। এটা হিংসা, যেহেতু এটা প্রকৃতিগত তাই এটা গ্রহণীয় হিংসা। এক্ষেত্রে 'অহিংসা পরম ধর্ম' ডাহা ফেল। তাই অহিংসার পূজকরাও এর বিরুদ্ধে কোনোদিন সত্যাগ্রহ করেনি।

মানুষ সংস্কৃতি মানসিকতা সম্পন্ন। সেইজন্য সে অহিংসার পূজারি। আর অহিংসা হলো একটি উচ্চ মানসিকতার প্রতিফলন নাকি দুর্বলতার নিদর্শন। কেউ কাউকে কোনো বিষয়ে হিংসা প্রদর্শন করলেও তাকে প্রতিহিংসা না দেখিয়ে যদি সমস্যাটির সমাধান করা যায় তবে অহিংসার প্রয়োগ ঘটে। সাধারণভাবে সেটা আমরা সকলেই করে থাকি। কিন্তু শত্রুপক্ষ কাউকে সমূলে উৎপাটন করতে চাইলে তার ওপর তাৎক্ষণিক প্রতিরোধ এবং হিংসা প্রয়োগ না করলে নিজের বিনাশ অনিবার্য। তাই হিংসা বিকল্পহীন এবং গ্রহণীয়।

বহুজন সুখায়, বহুজন হিতায়ের জন্য কোনো ব্যক্তি যদি ব্যক্তিগত স্বার্থ ব্যতিরেকে অনন্যোপায় হয়ে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তবে সে হিংসা কখনই নিন্দনীয় নয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধ বা শিশুপালকে হত্যা করার পর তাদের ছেলেদের হাতেই রাজ্যভার তুলে দেন এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। একইরকমভাবে শ্রীরামচন্দ্র রাবণ বধ করে তার ভাই বিভীষণের হাতে লঙ্কার দায়িত্বভার অর্পণ করেন। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তান আক্রমণ করে বহু সৈন্যের মৃত্যুর পর বাংলাদেশকে স্বাধীন করে মুজিবুরের হাতে শাসনভার তুলে দেন। উপরিউক্ত সকল হিংসাই শুধুমাত্র গ্রহণীয়ই নয়, আদরণীয় এবং প্রশংসনীয়। এটাই ভারতের শাশ্বত বাণী। গীতার ছত্রে ছত্রে এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই।

দণ্ড বা হিংসা থাকবেই। সেইজন্য আফজল গুরু, কাসভ বা ইয়াকুব মেমনের ফাঁসী হওয়া জরুরি। পাড়ার রকবিহারী বা স্বার্থান্বেষী দার্শনিক কুল বা ভোটাকাঙ্ক্ষী রাজনীতিবিদগণ এটাকে 'রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস' ভূষণে ভূষিত করছে। কারণ এদের কাছে দেশ একটি জড় বস্তু, মাতৃস্বরূপা নয়। বন্দেমাতরম্ এদের মুখে বর্তমান কিন্তু হৃদয়ে অনুপস্থিত।

অভিজ্ঞতা বলছে, প্রতিবাদ হিসাবে অহিংসা আন্দোলনের মাধ্যমে সুরাহা কেবল হিন্দুদের কাছ থেকেই আশা করা যায়। আর খৃষ্টানদের কাছ থেকে আংশিক ফল পাওয়া যায়। কিন্তু মুসলমানদের এবং মাওবাদীদের কাছ থেকে চাপ না থাকলে কোনো ফলই পাওয়া যায় না। উদাহরণ : মহম্মদ ঘোরী এবং পৃথ্বীরাজ চৌহান অথবা ১৯৮৯ সালে তিয়েন-এন-মেন স্কোয়ারে দশ হাজার ছাত্র হত্যার কাহিনি। তবে যীশুখৃষ্টের অহিংসার বাণী অনুসরণকারী আমেরিকা যারা খৃষ্টান ছাড়া অন্য কোনো ধর্মাবলম্বীকে দেশের সর্বোচ্চ পদে বসার অধিকার পর্যন্ত দেয়নি। তারা জাপানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জয়ের শেষ পর্যায়ে এসে আণবিক বোমা ফেলে কয়েক মিনিটে কয়েক লক্ষ লোককে হত্যা করে। এটা চরম সন্ত্রাস যার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিল না। কিন্তু এখনো তারা অহিংসার বাণী জ্ঞান দেবার জন্য প্রচার করে। এগুলো মুক্ত দৃষ্টিতে এবং খোলা মনে সকলের ভাবা উচিত। খৃষ্টান জার্মানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কয়েক লক্ষ ইহুদিদের হত্যা সংঘটিত করে। তখন কোথায় থাকে যীশুখৃষ্টের সেই অহিংসার বাণী? বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের ওপর ক্রমবর্ধমান হিংসার খবর এখনো আমাদের বেদনার কারণ। এই সূত্রে বলি, বিভিন্ন পুজোয় বলি বন্ধ করার ফতোয়া আজকাল একরকম চিন্তা ভাবনাহীন ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে অথচ এরা কেউই ইদের সময় গোরু হত্যা বন্ধ করার কথা বলে না। শুধুমাত্র তাই নয়, জৈন ধর্মাবলম্বীরা তো তবু নিরামিষাশী কিন্তু এরা কেউ নিরামিষাশীও নয়, এমনকী দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিনও এরা আমিষ খেয়ে থাকে। তাই এরা সর্বৈব ভণ্ড। বিবেকানন্দ বলেছিলেন 'এটা ভারতবর্ষ, এখানে শিব ডমরু বাজাবে আর মা কালী পাঁঠা খাবে। এর অন্যথা হবে না।'

অহিংসা পরম ধর্ম, এটা দুর্বলদের মন্ত্র শুধুমাত্র সমস্যাটাকে পাশ কাটানোর জন্য। সবল লোকের রাষ্ট্র চালনার জন্য শম, দম, দণ্ড, ভেদ-এর প্রয়োগ আবশ্যিক। তাই হিংসার প্রয়োগও প্রয়োজন, অন্যথায় আমরা রাজধর্ম থেকে বিচ্যুত হব।

আগামী পঞ্চাশ বছর আমরা অহিংসার মন্ত্র ছেড়ে রাষ্ট্রীয় ভাবে কল্যাণমূলক শক্তি প্রয়োগ করে প্রমাণ করি যে ভারতবর্ষ একটা শক্তিশালী দেশ আর আমাদের দেবী মা দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী যাঁরা সকলেই অমিতবিক্রমশালী অসুর নিধনে সিদ্ধহস্ত। তারপর না হয় আবার অহিংসা পরমধর্মের স্লোগান ফিরিয়ে আনা যাবে। তাই মায়নামারে ঢুকে আমাদের সামরিক বাহিনী জঙ্গিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক। পাকিস্তান ও চীন সীমান্তে শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা ছেড়ে প্রতি আক্রমণ বিচার্য বিষয় হোক।

পাঞ্চজন্য এখন আর আলাদা করে বাজে না। কিন্তু তার প্রতিধ্বনি আমাদের সবার মনে উঠছে তো? ভারতের অগ্রগতি শুরু হয়েছে। এই অগ্রগতিতে আমাদের সকলেরই কিছু অবদান থাকুক, আসুন এই মন্ত্রে আমরা সবাই দীক্ষিত হই।

নবান্ন উৎসবে গ্রামবাংলা

নবকুমার ভট্টাচার্য

।। অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ
অন্নই চেতনা
অন্নধ্বনি অন্নমন্ত্র
অন্ন আরাধনা।
অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি
সর্ব ধর্ম সার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত
অন্নই ওঙ্কার।।

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই সময় অন্নকে ঘিরে আমাদের যে উৎসব চলে তার নাম নবান্ন। নবান্ন সেই ফসলের জন্মদিন যে ফসল অন্ন হয়। এ বাংলা নবান্নের দেশ। নবান্ন গ্রামবাংলার একটি সুপ্রাচীন কৃষি উৎসব— অঘ্রাণ মাসের নবধান্য বরণের অনুষ্ঠান। কৃষি নির্ভর দেশে অঘ্রাণ মাস থেকে নতুন ফসল পর্বের আরম্ভ বলে এই মাস বাংলার সবচেয়ে সুখের মাস। এককালে নবান্ন উৎসবের মধ্য দিয়ে নতুন বছর শুরু হত। কৃষকদের ঘরে ঘরে এনে দিত আনন্দের জোয়ার। এখন নবান্নের কোনো নির্দিষ্ট বার তিথি নেই। প্রয়োজন হয় না কোনো ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরও। অঘ্রাণ মাসের একটি শুভ দিনে অনুষ্ঠিত হয় নতুন ধান্যের এই হৈমন্তিক পার্বণ। ধনধান্য কথাটা কেবল সঙ্গীত নয়, জীবনেও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই বঙ্গদেশে। বাংলার নদীমাতৃক স্নিগ্ধ ক্ষেত্রে ধানই হচ্ছে এ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ফসল।

বাংলার গৃহস্থ বধূদের কাছে ধান হচ্ছে লক্ষ্মী। ধানকে ঘিরেই যত আশা ও আকাঙ্ক্ষা। তাই ধান্য-লক্ষ্মীকে সাদরে বরণ করতে পালন করা হয় কিছু মেয়েলি আচার। সারা কার্তিক মাস কৃষক বধূরা ভরা ধান ক্ষেতে সাঁঝবাতি দেখান। তার পূর্বে ধানে যখন 'দুধ' আসে, তখন বাংলার কোনো কোনো অঞ্চলে ধানকে সাধ খাওয়ানো হয়। কাঁচা হলুদ বাটা আর সর্ষের তেল মিশিয়ে ধান ক্ষেতে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। হেমন্তই ফসল কাটার সময়। এই সময়ে ফসল কাটার জন্য একটি শুভ দিনের অনুসন্ধান করে কৃষক। তারপর সেই কাঙ্ক্ষিত শুভদিনে কেটে আনে ক্ষেতের পাকা সোনালি ধান। এটিকে 'আগধান' অনুষ্ঠান বলে। 'আগধান' এ জন্যে যে, এদিনে কৃষক কেবল একগুচ্ছ পাকাধান কেটে মাথায় করে বাড়ি নিয়ে আসে। এই ধান ঘরে তোলার পূর্বে ঘর-দোর ও উঠোন ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নেওয়া হয়। ধান কেটে ঘরে ফেরার সময় কারো সঙ্গে কথা বলাও নিষিদ্ধ। এই দিন পাড়া- প্রতিবেশী কাউকে কিছু দেবারও নিয়ম নেই এবং এসবই সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করা হয়। একগুচ্ছ ধান ঘরে এনে কৃষক তা ঠাকুর ঘরে ঝুলিয়ে রাখে। কোনো কোনো এলাকায় ফসল কাটার আগে বিজোড় সংখ্যক ধানের ছড়া কেটে নিয়ে ঘরের চালে বেঁধে রাখা হয়। বাকি অংশ চাল করে নতুন চালের পায়েস রান্না করা হয়।

সারা অঘ্রাণ মাস ধরে ধান কাটা হয়। ধান কাটার গান গাওয়া হয় গ্রামে গ্রামে। সেই গানে বাংলার মুখ দেখা যায়। মুখর হয়ে ওঠে বাংলার মাঠ ঘাট প্রান্তর। হেমন্তের সোনালি আমন ধানে গোলা ভরলেই নবান্নের উৎসব। মেয়েদের কণ্ঠে গুনগুনিয়ে ওঠে ধান ভানার গীত। —'ধান কুটি পরিপাটি, ধান আমাদের লক্ষ্মীমাটি'। এই সময় পাড়ায় পাড়ায় ঢেঁকিতে ধান ভানার শব্দে সারাগ্রাম মুখরিত হয়ে ওঠে। বাঙালির হেমন্তের এই অপূর্ব দৃশ্যটি কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) চোখে ধরা পড়েছে এই ভাবে—

'চারিদিকে নুয়ে পড়ে ফলেছে ফসল
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল,
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে-থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণেভরা আমাদের ভাড়ারের দেশে...
...আহ্লাদে অবসাদে ভরে আসে আমার শরীর
চারিদিকে ছায়া-রোদ-খুদ-কুঁড়ো-কার্তিকের ভিড়
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধকাণ,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি ধানভরা
রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ'।
(অবসরের গান)

হেমন্তের শেষ ফসল কাটার সময়ও এদেশের বহু অঞ্চলে আরেকটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এ আচারটির নাম 'ধান

ওঠা' অনুষ্ঠান। যেদিন ফসল কাটা শেষ হবে, সেদিন থেকে শুরু করে গোলায় ধান উঠানো পর্যন্ত সেখানে একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা হয় সর্বক্ষণ। এর সঙ্গে সুপুরি ও ধান দুর্বাও থাকে। এভাবেই প্রতি হেমন্তে বাঙালি কৃষকের ছোট ছোট আঙিনাগুলি সোনার ধানে ভরে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—

'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট সে তরী
আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি।'

ধান মাড়াই ঝাড়াই ও ভানার কাজ সাঙ্গ হলে মেয়েরা সারা বাড়ি ধোয়া মোছা করে আলপনা আঁকেন ঘরের দাওয়ায়, উঠোনে। আর এ সময়েই কৃষকের ঘরে ঘরে নবান্ন উৎসবের বিপুল সাড়া পড়ে। শুভদিনের সকালে মেয়েরা স্নান সেরে নতুন চাল, ক্ষীর, নতুন গুড়, দুধ ও ফলের কুচি দিয়ে নবান্নের নৈবেদ্য তৈরি করে উলু শঙ্খধ্বনি দিয়ে কুলদেবতাকে নিবেদন করেন। নতুন আমন ধান ওঠার পর তার থেকে পাওয়া চাল নিজেরা খাবার আগে পিতৃপুরুষের আত্মার উদ্দেশে রন্ধনশেষে নিবেদন করার প্রথা রয়েছে এই উপলক্ষে। মনে করা হয় পিতৃপুরুষ কাকের রূপ ধরে এসে নবান্নের অংশ গ্রহণ করে যান। শঙ্খ বাজিয়ে পূর্বপুরুষের আত্মাকে আহ্বান করার প্রথা রয়েছে এই উৎসবে। সাঁওতাল সমাজে প্রচলিত 'নওয়াই' উৎসবও নবান্নের সঙ্গে তুলনীয়। রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ধান তোলা বা 'আকলাই নেওয়া' অনুষ্ঠান নবান্নেরই অনুসারী। মালদা জেলায় আবার নবান্নের অনুষ্ঠান উৎসবের রূপ নিয়েছে। তিনদিন ধরে এই অনুষ্ঠান চলে। নির্ধারিত দিনের পূর্বদিন নখ কেটে স্নান করে সংযম পালন করতে হয়। সেদিন দিনে দই খই আর ডাল ভিজানো এবং রাতে পাঁচ রকমের সবজি দিয়ে তরকারী রান্না করে ভাত খেতে হয়। দ্বিতীয় দিন সকালে লক্ষ্মীনারায়ণ পুজো হয়। এইদিন দই আর চিড়ের আহার এবং রাতে নতুন ধানের ভাত ব্যঞ্জনসহ নবান্ন পালন। নবান্ন রান্না করার জন্য পঞ্জিকায় শুভ সময় দেখে আগুন জ্বালাতে হয়। রান্নার জন্য উনুনের চারপাশে আলপনা আঁকা হয়। নবান্ন করার আগে তিনটি কলাপাতায় রান্না করা পদগুলি পায়েস ও পানসহ সাজাতে হয়। একটি নদীতে ভাসিয়ে দিতে হয় পূর্ব পুরুষদের জন্য। দ্বিতীয়টি কাকের উদ্দেশ্যে নিবেদন করা হয় এবং তৃতীয়টি দেওয়া হয় বাড়ির গোরুকে। তৃতীয়দিন বাসি 'নবান্ন' আগের দিনের বাড়তি রান্নার সঙ্গে লাউ এবং মাছ অবশ্যই খাওয়ার নিয়ম। ড. পল্লব সেনগুপ্ত তাঁর 'পূজা পার্বণের উৎসকথা' গ্রন্থে লিখেছেন, 'নবান্নকে খাদ্য দেবতারূপে গণ্য করা হয়ে থাকে। পূর্বপুরুষের আত্মা কাকরূপে নবান্ন গ্রহণ করে গেলে বাকি খাদ্যটা তাঁদের প্রসাদরূপেই গণ্য হয়। পিতৃপুরুষের আত্মা সেখানে দেবকল্প। এখানে একটা আকর্ষণীয় ব্যাপার দেখা যাচ্ছে— নবান্ন একই সঙ্গে দেবতার প্রসাদ এবং দেবতাকল্প। এ ধরনের সংস্কারের বিমিশ্রণ নিতান্তই দুর্লভ।' চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁর 'হিন্দুর আচার অনুষ্ঠান' গ্রন্থে পূর্বে ঘরে ঘরে এই অনুষ্ঠান ও আনুষঙ্গিক উৎসবের প্রচলন ছিল বলেই উল্লেখ করেছেন। স্মার্ত রঘুনন্দন তাঁর 'তিথিতত্ত্বম্' গ্রন্থে নবান্ন শ্রাদ্ধ করবার কথা বলেছেন। মহাকবি কালিদাসও বলেছেন, আমাদের যজ্ঞের উদ্দেশ্যও এই ধান্যসংবর্ধনা।

নবান্ন উৎসবের প্রথম ও শেষ কথা হলো অন্নের বণ্টন বা বিতরণ। সকলের পরিতৃপ্তির মধ্যেই সার্থক হয় নবান্নের উৎসব। শ্রীমদ্ভগবত গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যারা কেবল নিজের জন্য পাক করে তারা পাপ ভোজন করে। সকলকে সশ্রদ্ধ চিত্তে দান করে দাত্রীর কাছে ঋণ স্বীকার অনুগ্রহণের রীতিই নবান্নের পরম মাধুর্য। তাই নবান্নের উৎসব এক সর্বজনীন মঙ্গলানুষ্ঠান।

নতুন শস্য ঘরে উঠলে আনন্দোৎসবের রেওয়াজ বিশ্বজনীন এবং তার বয়সও অনেক হাজার বছর। কৃষির উদ্ভবের পর থেকেই এই শস্য উৎসবের ধারা প্রচলিত হয়েছে সমস্ত দেশের সমস্ত সমাজে। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, রাশিয়া, কানাডা-সহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নতুন ফসল উঠা উপলক্ষে নবান্ন উৎসব উদযাপিত হয়। আমেরিকায় এ উৎসবের নাম 'Thanks giving day'। এই উৎসবে সারা আমেরিকা জুড়ে একটা উৎসবের চেহারা ফুটে ওঠে। কানাডাতে এই নবান্ন উৎসব পালন করা হয় বেশ জাঁকজমক ভাবে। গির্জায় গির্জায় প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হয়। রাশিয়ায় 'রাদুনিৎসা'ও এ ধরনের একটি উৎসব। মোট কথা একই উৎসব বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে উদযাপনের রেওয়াজ রয়েছে। আমাদের দেশে এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে পালিত হয় অন্নোৎসব পোঙ্গল। অসমের মাঘ বিহু উৎসবেরও মুখবন্ধ এই সময়ে। গুজরাটে এই সময়েই শস্যোৎসব পালনের অনুষঙ্গ হিসেবে সূর্যদেবতার পুজোর দ্যোতক স্বরূপ ঘুড়ি উড়িয়ে আনন্দ করার রেওয়াজ রয়েছে। আদিবাসী সমাজে আমনের ঋতুর পরব হচ্ছে টুসু। অঘ্রাণ সংক্রান্তি থেকে মকর সংক্রান্তি অবধি এই এক মাস হলো টুসুর পালন কাল। টুসুর কোনো ঐতিহ্যবাহী মূর্তি নেই, যেটা আছে তা ভাবমূর্তি। টুসুকে বনবাসী মানুষেরা 'ঘরের মেয়ে' বলে মনে করেন। টুসু পরবের মূল কথা হলো— বৎসরান্তে ঘরে আসা মেয়েকে আপ্যায়ন। গানই হলো এই পার্বণের প্রধান অঙ্গ।

নিজের শ্রমের বিনিময়ে উৎপাদিত ফসলকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করার উৎসবই নবান্ন। হলকর্ষণ থেকে আরম্ভ করে ধান ঘরে তোলা পর্যন্ত বাংলার ঘরে ঘরে পালিত হয় উৎসবের নানা রূপকল্পনা। দুঃখ এই আজ বাংলাদেশে হেমন্ত আসে ঠিকই কিন্তু নবান্ন উৎসব আসে না কারণ আজ পরিতৃপ্ত স্বয়ংভর সেই গ্রামবাংলা নেই। জমি অধিগ্রহণের আতঙ্কে নবান্নের গন্ধে আনন্দমুখর সেই দিনগুলো স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কবির ভাষায়— 'পথের কেনারে দাঁড়ায়ে রয়েছে আমার ধানের খেত, আমার বুকের আশা নিরাশার বেদনার সঙ্কেত।' আজ বাংলার কৃষক রোগে শোকে অভাবে তাড়নায়, দুঃখে দারিদ্র্যে ও হতাশায় আমূল নিমজ্জিত। ঋণভারে জর্জরিত। তাই নবান্ন উৎসব আর তাদের স্পর্শ করে না। হেমন্তে নতুন ধানের অন্ন জুটলেও তা নবান্ন উৎসবের আঙ্গিকে নয়, প্রয়োজনের তাগিদে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে নবান্ন শব্দটি কেবল পাওয়া যাবে বইয়ের পাতায়। ■

শ্রীচৈতন্য পরবর্তী নতুন ধারার মন্দির

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

গিলাকাঁটিয়ার 'শিখর' দেউল

ড. প্রণব রায়

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার গোপীবল্লভপুর থানার অন্তর্গত গিলাকাঁটিয়া গ্রামটি ঝাড়গ্রাম শহর থেকে ৪৬ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রামটি লেখকের পরিদর্শনের সময় (১৯৭৭-৭৮) খুবই দুর্গম ছিল। ঝাড়গ্রাম কুঠিঘাট পাকা রাস্তায় কুঠিঘাটে সুপ্রশস্ত সুবর্ণরেখা নদী (কয়েক বছর আগে এর ওপর সেতু নির্মিত হয়েছে) গিলাকাঁটিয়া প্রায় ৪ কিলোমিটার দূরবর্তী। ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের সীমানা এই গ্রাম থেকে বেশি দূরে নয়। গ্রামটি খুব জনবিরল ছিল।

ওড়িশা ও পশ্চিমবাংলার একটি প্রান্তে অবস্থিত এই স্থানের ইঁটের তৈরি ওড়িশিরীতির 'শিখর' মন্দিরটি খুব উল্লেখযোগ্য। মন্দির দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত ও একটি জনমানবহীন প্রান্তরে অবস্থিত ছিল।

পূর্বমুখী এই মন্দিরটি 'সপ্তরথ' রেখ দেউল-এর সম্মুখ সংলগ্ন 'জগমোহন' দীর্ঘকাল বিধ্বস্ত। মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৪৫ ফুট। ওড়িশি 'রেখ'-রীতির হলেও প্রথাগতভাবে এখানে রেখের 'তলজাংঘ', 'বান্ধনা' ও উপরিজাংঘের কোনো সুস্পষ্ট বিভাগ চোখে পড়ে না। 'বরণ্ডি'র কয়েকটি মোড় অবশ্য লক্ষ করা যায়। গণ্ডির দেওয়াল শীর্ষদেশের কাছাকাছি। খাড়া উঠে গিয়ে হঠাৎ বক্রাকার ধারণ করেছে শীর্ষভাগের দিকে। শীর্ষে 'বেকি ঘণ্টা ও কলস' স্থাপিত।

মূল মন্দির বা দেউলের গণ্ডির ওপরের অংশে 'ঝাপ্পা সিংহ' প্রকৃত ওড়িশি দেউলের পরিচায়ক। প্রতিষ্ঠাকালীন লিপি এখন আর না থাকলেও মন্দিরটি যে বেশ প্রাচীন, তা অনুমান করা যায়। গর্ভগৃহের ভিতরের ছাদ 'খিলান' ও ভল্‌টের বদলে 'লহরা' করা।

এই মন্দিরে আগে শিবলিঙ্গ ছিল বলে জানা যায়। পরে মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির পরিত্যক্ত হলে মদনমোহন পার্শ্ববর্তী ডুমুরিয়া গ্রামে স্থানান্তরিত হন। গিলাকাঁটিয়ার আশপাশে খাল ও সাঁওতাল জাতি বাস করেন। দক্ষিণে পিতানৌর গ্রামে লোধা জাতিরও বাস আছে। মারহাট্টা বর্গিদের দখলে একসময় এই এলাকা ছিল। সে সময় তাঁরা এই মন্দিরে শিব প্রতিষ্ঠা করেন বলে জানা যায়।

তবুও ইঁটের এই সুদৃশ্য প্রকৃত ওড়িশিরীতির 'শিখর' দেউলটি আজো সে সময়ের স্থাপত্যকৌশলের পরিচায়ক। কোনো 'টেরাকোটা' মূর্তি এই মন্দিরে না থাকলেও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এটি অসাধারণ।

আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

*** মানুষের প্রধান শক্তি হলো আধ্যাত্মিক শক্তি। মানুষের প্রধান মনুষ্যত্ব আধ্যাত্মিকতা। শারীরিকতা ও মানসিকতা দেশ-কাল-পত্র— আশ্রয় করিয়া থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অনন্তকে আশ্রয় করিয়া থাকে। অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালের সহিত আমাদের যে যোগ আছে, আমরা যে বিচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র ক্ষুদ্র নহি, ইহা অনুভব করাই আধ্যাত্মিকতার একটি লক্ষণ।**

—আদি ব্রাহ্ম সমাজ লাইব্রেরী হলে ১৮৮৪ সালে 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক বক্তৃতায়।

*** অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া আমরা এখন সেই ঐতিহাসিককে আহ্বান করিতেছি যিনি সমস্ত ভারতবর্ষকে সম্মুখে মূর্তিমান করিয়া তুলিবেন। তিনি তাহার শ্রদ্ধার দ্বারা আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবেন, আমাদিগকে শ্রেষ্ঠতা দান করিবেন, আমাদের আত্ম উপহাস, আত্মঅবিশ্বাস অতি অনায়াসে তিরস্কৃত করিবেন, আমাদিগকে এমন প্রাচীন সম্পদের অধিকারী করিবেন যে পরের ছদ্মবেশে নিজের লজ্জা লুকাইবার আর প্রবৃত্তি থাকিবে না। এখন একথা আমরা বুঝিব, পৃথিবীতে ভারতবর্ষের একটি মহৎ স্থান আছে। ...পলিটিক্স এবং বাণিজ্যই আমাদের চরমতম গতিমুক্তি নয়। চিরায়ত আধ্যাত্মিকতাই আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।**

—ভারতবর্ষের ইতিহাস শীর্ষক ভাষণে মজুমদার লাইব্রেরীর আলোচনা সমিতিতে পঠিত, ১৯০২ সালের মে মাসে।

বোকামির ফল

জয়স্থল নগরে কোনো এক সময় বিষ্ণুস্বামী নামে এক ব্রাহ্মণপুত্র বসবাস করতেন। তাঁর ছিল চার পুত্র। এদের মধ্যে সবাই অপদার্থ। বড় ছেলেটি পাশা খেলত, মেজ ছেলেটি চরিত্রহীন, তৃতীয় ছেলেটি নির্লজ্জ, চতুর্থ ছেলেটি ছিল ঘোর নাস্তিক।

ব্রাহ্মণের পুত্রদের নিয়ে অশান্তিতে দিন কাটত। একদিন তিনি খুব বিরক্ত হয়ে পুত্রদের ডেকে বললেন, যারা পাশা খেলায় সময় নষ্ট করে, মা-লক্ষ্মী ভুলেও তাদের দিকে তাকান না। শাস্ত্র বলেছে, যে লোক পাশা খেলে তার নাক কান কেটে গাধার উপর চড়িয়ে দেশ থেকে বার করে দেবে। আর যে চরিত্রহীন তাকে শেষ পর্যন্ত চুরির আশ্রয় নিতে হয়। তার চার দিকেই অন্ধকার। এর ফলে তাকে একসময় রসাতলে যেতে হবে। আর যে নির্লজ্জ তাকে উপদেশ দেওয়া বা মন্দ বলা সবই বৃথা। তার লোকনিন্দার কোনো ভয় থাকে না। আর যে লোক পরলোকের ভয় করে না, দেবতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করে না, তার চেয়ে পাষণ্ড আর কে হতে পারে। তার সঙ্গে কথা বলাও পাপ। সংসারে সকলেই পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনা করে, আর আমি অন্তরের সঙ্গে তোমাদের মৃত্যু কামনা করছি।'

পিতার নিদারুণ কথা শুনে চারপুত্র লজ্জায় মাথা নিচু করল। তারা বুঝতে পারল, লেখাপড়া না শিখে কি ভুলই না তারা করেছে। তাই বিদ্যা অর্জন করতে চারজনই একসময় বিদেশে যাত্রা করল এবং নানাদেশে ঘুরে কিছুদিনের মধ্যেই প্রত্যেকে এক একটা বিদ্যা শিখে নিজের দেশের দিকে রওনা হলো।

দেশে ফেরার পথে ওরা দেখল একজন চর্মকার মৃত বাঘের মাংস ও চামড়া নিয়ে হাড়গুলো ফেলে রেখে চলে গেল।

তাদের মধ্যে প্রথম ভাই হাড়জোড়া দেওয়ার বিদ্যা শেখায় সে ছোটবড় হাড় জড়ো করে জোড়া দিয়ে দিল। দ্বিতীয় ভাই হাড়ে মাংস লাগাবার বিদ্যা শেখায় সে কঙ্কালে মাংস লাগিয়ে দিল। তৃতীয় ভাই মাংসের উপর চামড়া লাগিয়ে দিল। আর চতুর্থ ভাই মৃতদেহে প্রাণদানের বিদ্যা শেখায় সে প্রাণদান করল। আর বাঘ জীবিত হয়ে তাদেরই প্রথম হত্যা করল।

মনীষী কথা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

আসল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি হয়ে গেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জন্ম পশ্চিম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে, ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। গ্রামের পাঠশালার পাঠ শেষ করে পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিনি কলকাতায় আসেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতায় উচ্চ শিক্ষা সমাপ্ত করে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। বাংলা ভাষাকে সহজ করে শেখার জন্য প্রণয়ন করেন বর্ণ পরিচয়, কথামালা। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য বই হলো বেতাল পঞ্চবিংশতি, সীতার বনবাস ইত্যাদি। খুব মাতৃভক্ত ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র। মা ভগবতী দেবীর শিক্ষা তাকে করে তুলেছিল দয়ারসাগর। গরিব-দুঃখীদের জন্য অনেক কাজ করেছেন তিনি।

প্রশ্নবাণ

১.স্বাধীন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে?

২.অর্থশাস্ত্র কার লেখা?

৩.কোন্ কাব্যগ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান?

৪.'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির পরিচালক কে?

৫.'ব্যোমকেশ বক্সী' চরিত্রটির স্রষ্টা কে?

উত্তর : ১. ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ। ২. কৌটিল্য। ৩. গীতাঞ্জলি। ৪. সত্যজিৎ রায়। ৫. শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছবিতে অমিল খোঁজ

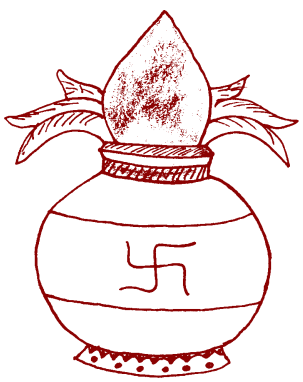

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) বে ন্দ বি ন

(২) নী কা জ র

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) কি দা র ত

(২) হে শা ন শা

৭ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) অভয়ারণ্য (২) কপালভাতি

৭ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) দশাবতার (২) বাক্যবাগীশ

উত্তরদাতার নাম

(১) সঞ্জয় বর্মন, জলপাইগুড়ি, (২) সোমরাজ মণ্ডল, সোনারপুর, দঃ ২৪ পরগণা (৩) নরেন্দ্রনাথ বারিক, আমতা, হাওড়া, (৪) সৌরজিৎ দে, যাদবপুর, কলকাতা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : ৮৪২০২৪০৫৮৪
E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

সন্ত্রাসীদের ত্রাস সংযুক্তা

রিনি রায়

নারীকে গার্হস্থ্য কর্মে নিপুণা হিসেবেই দেখতে চিরকাল অভ্যস্ত আমাদের এই দুটি চোখ। নারী ধীর, স্থির, শান্ত, নারী দু'হাতে সংসার সামলানো, সন্তান প্রতিপালনে দক্ষ। বর্তমানে তো নারী অবশ্য শুধু ঘর নয়, বাইরেও সামলাচ্ছে সহজাত দক্ষতার বলে। চিকিৎসা, প্রযুক্তি, রেল, ব্যাঙ্ক, বিমান, ব্যবসা, প্রশাসন, বিচার-ব্যবস্থা, শিক্ষা, শাসন, সাংবাদিকতা, মহাকাশ-গবেষণা, সেনাবাহিনী, পর্বত অভিযান এমন কোনো ক্ষেত্র নেই যেখানে ভারতীয় নারী নিজেদের কর্মদক্ষতার নজির রাখেনি বা রাখছে না। কিন্তু কোনো একজন মেয়ে সন্ত্রাসীদের ত্রাস! কলশনিকভ্ হাতে আধুনিক মহিষাসুরমর্দিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ! এ যেন ভাবতে সত্যিই আমাদের বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। শুভ অশুভের লড়াইয়ে সেই পৌরাণিককাল থেকেই অশুভের দমনে নারীকে ত্রিশূল হাতে, খড়্গ হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছে। বর্তমানেও এর উদাহরণ দুর্গার দেশে বিরল নয়।

সপ্ত সহোদরার (Seven sisters of North-Eastern States) কৃতী কন্যা সংযুক্তা পরাশর এমনই একজন বীরাঙ্গনা যাঁর ভয়ে ত্রাসের সঞ্চার ঘটে বোরো জঙ্গিদের বুকে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশনীতি নিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে পি এইচ ডি, এফ ফিল করে আসার পর তাঁর যথেষ্ট সুযোগ ছিল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অন্য কোনো পেশায় যুক্ত হয়ে নিশ্চিন্ত ও আরামের জীবনযাপন করার, কিন্তু তিনি সে পথে না হেঁটে পছন্দ করলেন আরক্ষা বাহিনীর (পুলিশ ফোর্স) ঝুঁকিপূর্ণ জীবনকে। ইন্ডিয়ান পুলিশ সার্ভিস (আইপিএস)-এর জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে লাগলেন এবং ২৭ বছর বয়সে আইপিএস পরীক্ষায় ৮৫তম স্থান অধিকার করে আরক্ষা বাহিনীতে যোগদান করেন। ২০০৬ ব্যাচের এই আধিকারিকের কর্মজীবন শুরু হয় অসমের অন্তর্গত মাকুমের অ্যাসিসটেন্ট কমানডান্ট হিসাবে। এর অব্যবহিত পরেই তাঁকে উদালগুড়ি প্রেরণ করা হয় বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী ও বোরোদের মধ্যে সংঘটিত জাতিদাঙ্গা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে। প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে অতি সক্রিয়তার সঙ্গে তিনি সেই দাঙ্গা দমন করে নিজের দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। তখন থেকেই তিনি নিয়মিতভাবে জঙ্গিদমন অভিযানে সি আর পি এফ জওয়ানদের নেতৃত্ব দেন। দিন-রাত এক করে দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঠেকাতে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন এই সাহসী কন্যা। মালডাঙ অঞ্চলে

সৈন্যদলের উপর হামলা হলে তিনি অসম পুলিশের কমান্ডো বাহিনী, কোবরা ব্যাটেলিয়ান, সি আর পি এফ সহযোগে অভিযান চালিয়ে চারজন জঙ্গিকে আটক করেন। শুধু তাই নয়, ৯ জুন, ২০১৫-এর 'ইন্ডিয়া টুডে'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, 'পরাশর, ২০০৬ ব্যাচের এই আইপিএস অফিসার এই অঞ্চলে ১৫ মাস ধরে বোরো বিদ্রোহী বিরোধী অভিযানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ১৬ জন বিদ্রোহীকে গুলি করে হত্যা করে, ৬৪ জনকে গত কয়েক মাসে গ্রেপ্তার করে এবং অস্ত্রশস্ত্র, গোলা-বারুদ বাজেয়াপ্ত করে তিনি বোরো দুষ্কৃতকারীদের মনে ভয়ের সঞ্চার করেছেন।" শুধু জঙ্গি নিধন নয়, সমাজে মহিলারা যাতে নিরাপদে চলাফেরা করতে পারে, তার জন্য তিনি সাধারণ পোশাকে মহিলা পুলিশদের নিয়োগ করেন যাতে মহিলাদের উত্যক্তকারী পুরুষদের গ্রেপ্তার করে উচিত শিক্ষা দেওয়া যায়। দুষ্কৃতী, অপরাধীদের কাছে সঙ্গীতা পরাশর লৌহমানবী হলেও এমনিতে তিনি খুবই সাধারণ, হাসিখুশি, অনুপ্রেরণাদায়ক নারী। যিনি ট্রাফিক নিয়ম মেনে হেলমেট পড়ে বাইক চালালে যেমন ক্যান্ডিও দেন, তেমন খেলোয়াড়দের সঙ্গেও করমর্দন করে উৎসাহ দিয়ে তাদের আরোও উৎসাহিত করেন। ভাবী প্রজন্মকে দেশের কাজে, সরকারের কাজে যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করেন। ইংরেজি নববর্ষের প্রাক্কালে সবাই যখন পার্টি, হই-হুল্লোড়ে ব্যস্ত, তখন তিনি বাড়ি থেকে দূরে থাকা রিলিফ ক্যাম্পে কালাতিপাত করা মানুষগুলোর পাশে থেকে সময় কাটান। সেখানে নিয়োজিত পুলিশ বাহিনীর সুবিধা-অসুবিধার খবর নেন। ২০১৪ থেকে এখনও পর্যন্ত তিনি অসমের শোণিতপুরের সুপরিনটেনডেন্ট পদে কর্মরতা সংযুক্তা পরাশর। দেশ ও দশের কাজে প্রাণাতিপাত করা এই মহিলা পুলিশ আধিকারিক মাতৃত্বের দায়িত্বও অতি নিপুণভাবে সামলাচ্ছেন। কর্মসূত্রে বাড়ি থেকে দূরে থাকলেও নিজের দু' বছরের সন্তানের প্রতি তার মমত্ব বা দায়িত্বের কোনো অভাব হয় না।

এইটাই বোধহয় ভারতীয় নারীর মহিমা। সকল কাজের মধ্যেও বাৎসল্য প্রেমে কোনো খামতি থাকে না। ভারতীয় নারী যে কী অসীম শক্তির আধার তা সংযুক্ত পরাশর নিজের কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে দিচ্ছেন এবং অন্য মহিলাদেরও সমাজের কাজে, দেশের কাজে ও আরক্ষা বাহিনীতে যোগাদানে উৎসাহিত করছেন।

ভারতের গণতন্ত্র বিকশিত হতে পারছে না

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

অতীতে জার্মানির Weimer Republic অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র সম্পর্কে বলা হোত প্রজাতন্ত্র নাম হলেও এই শাসন পদ্ধতিতে গণতান্ত্রিক প্রথাই যে অনুসৃত হবে এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। তাই একটা দেশের সংবিধান আসলে ঠিক ততটাই ভাল ঠিক যতটা তাদের নাগরিকদের রাজনৈতিক সংস্কৃতি তাকে ভাল থাকতে দেবে।

এই কথাটা যে কতদূর অকাট্য সত্যি তার হাতে গরম প্রমাণ পাওয়া গেল গত সপ্তাহে সংসদের ক্রিয়াকলাপ দেখে। বিতর্কের মূল বিষয় ছিল দিনটিকে সংবিধান দিবস হিসেবে গণ্য করার সূত্রে ও তথাকথিত অসহিষ্ণুতার তীব্র বাতাবরণকে কেন্দ্র করে। অনেকগুলি সুখশ্রাব্য গালভরা বক্তৃতা শুনতে পাওয়া যায়। এছাড়া দেশবাসীর সংবিধানে বর্ণিত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের ওপর সর্বসম্মত আস্থা সমর্পণ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

এবারে মূল ফোকাসটি ছিল সরকারের তরফে যাতে জনজীবনে কোনো প্রাচীন জাতিগত

> বাস্তবে সংখ্যার বিচারেই কংগ্রেস শুধু নগণ্য হয়েই পড়েনি, অন্যান্য তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিদের কৌশলগত নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও তার নিয়ন্ত্রণ বেশ আলগা হয়ে গেছে। এর ওপরেও রয়েছে কংগ্রেসী সংগঠনের চাক্ষুষ দুর্বলতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাদের পক্ষে বিজেপি-বিরোধী লড়াইকে রাস্তায় নেমে পরিচালিত করা বেশ কঠিন।

ভাবধারা যেন মাথাচাড়া দিয়ে তাকে অস্থির করতে না পারে, সে বিষয়ে নজর দেওয়া। এই বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আদৌ জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। অন্তত আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি বিগত ১৮ মাসে এমন কিছুই ঘটেনি যাতে আদৌ ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো বিপদসঙ্কেত রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে এ বিষয়ে শাসকদল ও তার ভূমিকা পিঠের একটা দিক মাত্র, অপর পিঠটিতে কিন্তু রয়েছেন বিরোধীরা। আর এখানে আরও একটা কথা খুব মন দিয়ে ভাবতে হবে যে আমাদের সংবিধান রচনার সময় তার রচয়িতাদের দেশের সংসদে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ও ভূমিকার কথা তেমনভাবে মোটেই বিবেচনা করতে হয়নি। যতই যেখানে বাম অথবা ডান উভয় পক্ষ থেকেই শ্যামাপ্রসাদ, হীরেন মুখার্জী, মিনু মাসানি, পিলু মোদী, রামমনোহর লোহিয়া, ভূপেশ গুপ্ত বা অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো ব্যক্তিগতভাবে দিক্‌পাল সাংসদ থাকুন না কেন।

এখানে ড. রামসুভগ সিং কংগ্রেস ভাগাভাগির পর ১৯৬৯ সালে প্রথম বিরোধী নেতার তকমা পান। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৭ সালেই প্রথম জনতার নির্বাচনের মাধ্যমে সংসদে সরকারিভাবে বিরোধী দলনেতার পদ সৃষ্টি হয়। আবার অষ্টম লোকসভা (১৯৮৪-৮৯)-এর দিকে তাকালে দেখা যাবে সেখানে সেই অর্থে কোনো বিরোধী দলের অস্তিত্বই ছিল না। তেলুগু দেশম তার সামান্য কিছু সংখ্যার কম বেশিতে নামকাওয়াস্তে বিরোধী ভূমিকায় ছিল। তাই সংসদীয় বিরোধী রাজনীতি তুলনামূলকভাবে বেশ অর্বাচীন একটা বিষয়। সেই সূত্রে বর্তমান বিরোধী দলের যে ক্রিয়াকলাপ দেখা যাচ্ছে তাতে একটা বিষয় পরিষ্কার। ভারতের গণতান্ত্রিক বিবর্তনের পথ চলা এখনও যথেষ্ট বাকি। খুব বেশি হলে এদিকে কাজ এগিয়ে চলেছে (work in progress) অবধি বলা যায়। আর এক্ষেত্রে সরকার তার দায় দায়িত্ব সম্পর্কে খানিকটা সচেতন হলেও বিরোধী দলের পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে দায় দায়িত্ব বুঝে নিতে এখনও বেশ দেরি আছে।

ভাববেন না, এ কথাটা আজকের বিরোধী কংগ্রেস দল ও তাদের ৪৫ জন সাংসদ নিয়ে যেনতেন প্রকারেণ লোকসভা বানচাল করে অস্তিত্ব প্রমাণ করার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাতে বলা।

অবশ্যই ২০০৪-২০১৪ পর্যন্ত বিরোধী আসনে থাকাকালীন বিজেপি দলের আচরণও খুবই গঠনমূলক ও আগ বাড়িয়ে বলার মতো ছিল এমনটাও নয়। এর মূলে রয়েছে বিরোধী দলের ভূমিকা সম্বন্ধে ঐক্যমত্যের অভাব। যে কারণে গত সংবিধান দিবসের বিতর্কের দিন দেখা গেল বেশ কিছু সংসদীয় বিষয়কে অনায়াসে জনতার দরবারে অর্থাৎ রাস্তায় নিয়ে গিয়ে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের রূপ নেওয়ার হুমকি দেওয়া হলো। আর সদা ক্ষুধার্ত মিডিয়া তা চেটেপুটে খেয়ে দেশবাসীকেও উচ্ছিষ্ট দিল। তাদের মনে হলো আহা কী যুগান্তকারী বক্তৃতাই না হলো!

প্রসঙ্গত কমিউনিস্টরা যারা এখনও স্থির নিশ্চিত নয় যে সংসদের একটা সুকুমার

সৌন্দর্য আছে, না কি তা এখনও Lenin -এর কথামতো 'শুয়োরের খোঁয়াড়', তারাও এই সুযোগে কিছু অসংসদীয় বিষয়ে কথাবার্তা বলে নিল। কিছুদিন আগে আমাকে এক পুরনো কমিউনিস্ট নেতা বলছিলেন, ''অন্যান্য দলে যেমন তাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিটিকেই সংসদে পাঠানো হয়, সিপিআই(এম)-এর ক্ষেত্রে কিন্তু সংসদীয় প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্থানাধিকারীরাই মনোনীত হন বা তাদেরই নামানো হয়।'' আমি জানি না এই মতামত এখনও কতদূর সত্যি, কেননা এখন দলের একজন সম্পাদক যিনি আবার রাজ্যসভার সাংসদ হওয়ার সুবাদে যথেষ্ট সফল ও গ্রহণীয়। যাই হোক, এই বুর্জোয়া সাংসদবৃত্তিতে কমিউনিস্টদের অনেক সময় অস্বস্তি থাকলেও অতি প্রাচীন কংগ্রেস দলের সমস্যা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই পিতামহ-প্রতিম দলটির কিন্তু দেশের সংবিধান নিয়ে কোনো সমস্যা নেই। তারাই তো এটি নিয়ে বারংবার নাড়াচাড়া করেছে। প্রয়োজন মতো এর থেকে উদ্ভূত সুবিধাগুলি নিজের মতো করে কাজে লাগিয়েছে। বস্তুতপক্ষে সরকার পরিচালনা করাটা তাঁরা নিজেদের স্বর্গীয় অধিকার বলেই সাধারণত মনে করে। আর এই শাসন অধিকার এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে সমানভাবে হস্তান্তরিত হয়। হঠাৎ করে বিরোধী দলে বসে কিছুতেই নিজের ভূমিকার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছে না শাসন-অভ্যস্ত এই দল। কিন্তু তাদের এই ভূমিকা একেবারে প্রথম এমনটা নয়। অতীতে ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৯, ১৯৮৯ থেকে ১৯৯০, আবার ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ কংগ্রেস বিরোধী দলেই ছিল। কিন্তু তদানীন্তন পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। ৭৭-এর জনতা সরকারের সময় ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দলের অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলিকে মোকাবিলা করার পাশাপাশি জোড়াতালির জনতা সরকারের চলমান দলগুলির মধ্যে ফাটল ধরানোর কাজেই বেশি লিপ্ত ছিলেন। আবার বাজপেয়ী আমলে দল সোনিয়া গান্ধীকে সর্বোচ্চ পদে ধরে রাখার বিষয়ে সবিশেষ ব্যস্ত ছিল। তাই ২০০৪ সালের নির্বাচনে বিজেপি-র পরাজয় ও বামপন্থী সমর্থনে সরকারের চলে যাওয়াটা সেই কারণে কোনো নির্দিষ্ট পরিকল্পনা বা ছকের ফলশ্রুতিতে ঘটেনি, ঘটেছিল পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা হিসেবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে বিধ্বংসী পরাজয়ের পরবর্তী সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে কিন্তু অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব নেই। পরিবারতন্ত্র পূর্ণ মহিমায় বিরাজমান। যুবরাজ রাহুলের অভিষেক শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো কংগ্রেস দেশের রাজ্যে রাজ্যে তেমনভাবে কোথাও শক্তিমান বিরোধীদের ভূমিকাতেও নেই। বিহারে দেখুন নিতান্তই ছোট শরিক হিসেবে তারা জোটে রয়েছে। বিষয়টা তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেসকে বিজেপি-বিরোধী দলগুলির সঙ্গে রাজনৈতিক পরিসর ভাগ করে নিতে হবে। যেমন অখিলেশ যাদব যখন উত্তরপ্রদেশের মহাজোট করার জল মাপতে মুলায়মের নেতৃত্বের অধীনে কাজ করার প্রসঙ্গ তুললেন সেটা কংগ্রেসকর্মীদের নিশ্চয় পছন্দ হয়নি। দেশের অনেক প্রদেশে কিন্তু নীতীশকুমারকে সামনে রেখে ২০১৯ সালে মোদীর মোকাবিলার কথা নাড়াচাড়া হচ্ছে।

বাস্তবে সংখ্যার বিচারেই কংগ্রেস শুধু নগণ্য হয়েই পড়েনি, অন্যান্য তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিদের কৌশলগত নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রেও তার নিয়ন্ত্রণ বেশ আলগা হয়ে গেছে। এর ওপরেও রয়েছে কংগ্রেসী সংগঠনের চাক্ষুষ দুর্বলতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাদের পক্ষে বিজেপি-বিরোধী লড়াইকে রাস্তায় নেমে পরিচালিত করা বেশ কঠিন। খুব বেশি হলে তারা টিভির চ্যানেলগুলিতে নিরাপদে এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে।

কতকগুলি ঘটনাপঞ্জীকে একটু মিলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে কেন কংগ্রেস রাজ্যসভায় তার ধামাধরা বাহিনীকে ব্যবহার করে বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এই প্রত্যক্ষ জনসমর্থনহীন নেতাদের একটিই অস্ত্র সংসদের অধিবেশন বানচাল করা। অবশ্য চাতুরি করে মাঝে মাঝে তারা এটা প্রমাণ করার চেষ্টাও করবে যে তারা যথার্থই একটি গঠনমূলক বিরোধীদল যারা সর্বদা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে উদগ্রীব।

বাস্তবে কিন্তু তারা আদৌ ঐক্যমত্যের রাজনীতি বা কনসেনসাস তৈরি করে চলার পক্ষে নয়। কথাটা জিএসটি (পণ্য পরিষেবা কর) হোক বা আর যে কোনো বিলের ক্ষেত্রেই হোক না কেন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, বলতে কুণ্ঠা নেই একটি কেবল একটিই তা সরকারকে কাজ করতে না দিয়ে পঙ্গু করে রাখা। এটি ইতিহাসে দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত এক সম্পূর্ণ বিষম যুদ্ধের নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

হায়! প্রাজ্ঞ সংবিধান প্রণেতারা তাঁদের দূরতম স্বপ্নেও ভাবেননি যে সংসদে এমন একটা দিন আসবে যখন বিরোধীপক্ষ কায়মনোবাক্যে এমনকী শক্তি প্রয়োগ করেও সরকারকে দেশের জন্য সরকারি কাজ করতে দেবে না। এটি অবশ্যই সংবিধান সংক্রান্ত এক বিচিত্র সমস্যা যা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রাথমিক শর্তকে লঙ্ঘন করার, পরাজয়কে মেনে না নেওয়ার ধৃষ্টতা থেকে সৃষ্ট। ■

Swachchha Bharat Swabolombee Bharat

How to build a nice home, think of us

WE PROVIDE :-

+ Low Cost readymade Latrine (Toilet) + Low Cost House
+ Low Cost Domestic Dustbin & Domestic Biogas Plant
+ Heat & Waterproof Solution for your heated roof.

Contact

ABC ENGINEERS & SERVICES

"PARK PLAZA" Room No. 11 & 12, 71,
Park Street, Kolkata - 700 016
M : 98311 85740, 98312 72657,
Visit Our Website : www.calcuttawaterproofing.com

ডালিম জ্যেঠু

শেখর সেনগুপ্ত

বিবেক, নীতি এইগুলি নিয়ে একধরনের নেতা-নেত্রীর বচন-জাল শুনলে সাধারণ মানুষ মুচকি হেসে পাশ কাটান; অনেকে একটু আড়ালে গিয়ে কানে আঙুল দেন। যেমন আমি যে পুরএলাকায় ফ্ল্যাট খরিদ করে প্রায় এক যুগ ধরে বসবাস করছি, তার দোর্দণ্ডপ্রতাপ প্রাক্তন পুরপ্রধান বেমক্কা ডিগবাজি খেলেন— লাল টুপিকে পায়ের তলায় পিষে ঘাসফুল চিহ্নিত জোব্বায় নিজেকে ঢেকে ফেললেন। এ নিয়ে আপাতভাবে মিডিয়া সমেত সর্বত্র যে স্বর্গ-মর্ত্য তোলপাড় চলছে, তার পিছনে কিন্তু বিলক্ষণ ফল্গুধারার মতন বইছে হাস্যরস। ক্ষমতার লোভে সেজ, মেজ, ছোট ইত্যাকার নেতা-নেত্রীদের আজব চরকিবাজি দেখে কেমন যেন দুঃখ হয়। হাসিও আসে। এঁদের মধ্যে কী এমন একজনও নেই, যিনি আদর্শ ও বিশ্বাসের খাতিরে আত্মবিসর্জনেও প্রস্তুত? আমি কিন্তু আমার বাল্যে এ রকম বেশ কিছু মানুষকে দেখেছি। তাঁরা সৎ, দেশপ্রেমী, মহান নেতার প্রতি আস্থাবান এবং সেই দেবপ্রতিম নেতাকে যখন ষড়যন্ত্রের বলি হতে দেখেন, ক্ষোভে-দুঃখে নিজেকেই শেষ করে দিতে চান। যেমন দেখেছিলাম ডালিম জ্যেঠুকে— আজ থেকে প্রায় বাষট্টি বছর আগে। ঘটনা ঘটেছিল অধমের সামান্য জীবনের ঊষাকালে। পড়তি বয়সের নির্জনতা কখন বুঝি ঠেলে নিয়ে যায় ওই পর্বে। ছোট ছোট দৃশ্য ও ঘটনা চুলের মুঠি ধরে দাঁড় করায় এবং আধিভৌতিক স্বরে যেন বলে, 'ভুলবি না। ভোলাটা পাপ।'

আমিও তখন আদ্যন্ত হাতড়ে দেখছি, এই বাঙালি জাতির সর্বাঙ্গে কত কালসিটের দাগ! অথচ আমরা ভুলে থাকি। পাপ করি। স্মৃতি আমাদের উদ্বেল করে না। কী লজ্জা!

সে সময় আমি ক্লাস থ্রির ছাত্র। স্কুল কসবায়। স্কুলের নাম চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়। আমাদের বাড়ি হালতুতে। হালতু থেকে কসবা— নিত্য পাড়ি দিলেও মনে হয় কেমন যেন অচেনা। অস্বস্তির অন্যতম কারণ হালতুতে তখন প্রায় প্রতিদিন নতুন নতুন পরিবার এসে ঢুকছে আশ্রয়ের খোঁজে। সমস্ত ছিন্নমূল হিন্দু পরিবার। অনেককে দেখতে পাই, একরাশ উদ্বেগ নিয়ে ইতস্তত হাঁটাহাঁটি করছেন। চোখে-মুখে উদ্বেগের ছাপ, যেন তখনও আতঙ্কে শিহরিত। ছ' বছর আগে দেশ স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীনতা তো নয়, যেন ধরে ধরে পূর্ববঙ্গের হিন্দু পরিবারগুলির সর্বনাশ করা। যদিও এ স্মৃতি আমার কৈশোরের, তবু আজও মাঝে মাঝে যেন আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে যায়। আজ যে আমি কলম খুলে লিখতে পারছি, সেই স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্য আরও কয়েক কোটি বাঙালির সঙ্গে আমিও কৃতজ্ঞ দুই যুগন্ধর মহামানবের নিকট--- ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা তপস্বী স্বামী

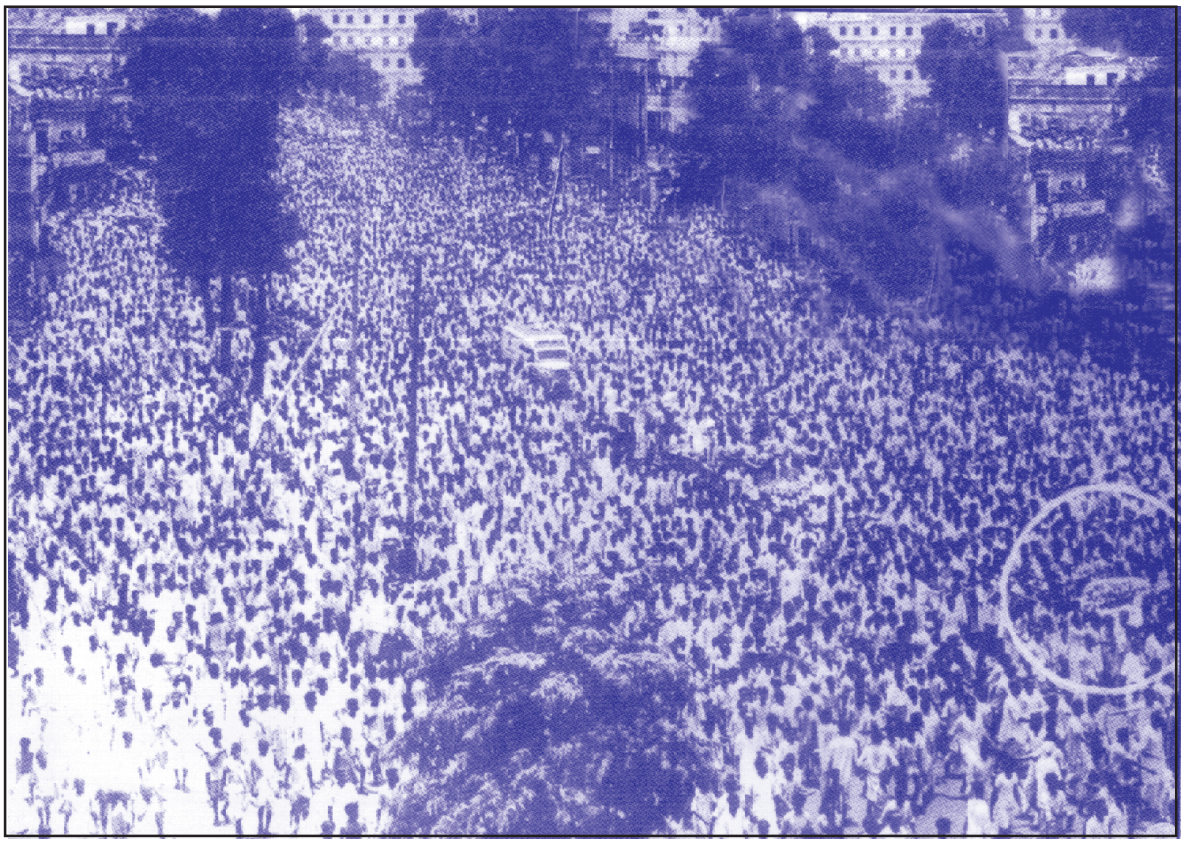

২৪ জুন, ১৯৫৩, কলকাতা ড. শ্যামাপ্রসাদের অন্তিমযাত্রা

প্রণবানন্দজী এবং স্যার আশুতোষ-তনয় ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়— যাঁরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলেই ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হতে পেরেছে বাঙালির ঠিকানা পশ্চিমবঙ্গ।

আমার এক কাকা মতি সেন তখন হালতুতে বামপন্থীদের ডাকসাইটে নেতা। তাঁর সংগঠনের স্বার্থেই তিনি তখন ছিন্নমূল মানুষগুলির অনুভবের কাছে পৌঁছে যাবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু কদাপি দেশভাগ তথা বাঙালি হিন্দুদের সর্বনাশ নিয়ে একটি কথাও বলতেন না। আর এক কাকা সন্তোষ সেন রেলওয়ের পদস্থ আধিকারিক। রাজনীতির কথা উঠলেই একেবারে ছিলাছুট তির— আমি এসবের মধ্যে নেই। কিন্তু আমাদের নিকট প্রতিবেশী ডালিম মজুমদার— যাঁকে আমি বলতাম ডালিম জ্যেঠু— একেবারে ভিন্ন চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ। মিলিটারিতে ছিলেন। দ্বিতীয় মহাসমরে সাহারায় লড়েছেন মরুশার্দুল রোমেলের ট্যাঙ্কবাহিনীর বিরুদ্ধে। নিঃসন্তান। আদি নিবাস বরিশালের গ্রাম ঝালকাঠি। দেশভাগ ও দাঙ্গার প্রসঙ্গ উঠলেই ঝমঝমিয়ে বেজে উঠত তাঁর ক্ষোভ ও জ্বালা। বলতেন, 'হিন্দু বাঙালির আজ একমাত্র খড়কুটো হলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। বাকি তো সবটাই নোনা সমুদ্র। ভয়ঙ্কর আছাড়ি-পিছাড়ি। আজ সেইদিন এসেছে যখন প্রত্যেক হিন্দু, প্রত্যেক হিন্দুর আত্মীয় পরিজনদের নিজেদের মধ্যকার সমস্ত ছুটকো-ছাটকা বিরোধকে ভুলে যেতে হবে।' আমি তখন ওই সমস্ত কথার তাৎপর্য বুঝতাম না। কিন্তু জ্যেঠুর আবেগ ও বিশ্বাস যে কত নিখাদ এবং সেখানে যে বিন্দুমাত্রও আজগুবি কিছু নেই, আমার সরল অনুভূতিতে তা ধরা পড়ল।

জ্যেঠিমা সুন্দরী, গায়ের রং ধবধবে, কথা বলেন কম। তাঁরও অনেক স্নেহ-মমত্ব আমার প্রতি। অনেক পরে জেনেছিলাম, তিনি কবিতা লেখেন। ছড়া লেখেন। তা ছাপাও হয় কাগজে। আমার মাথায় হাত দিয়ে একদিন তিনি গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠেন—

তোমায় কিন্তু সোনামনি আসতে হবে বারোমাস
তবেই তোমার পূর্ণ হবে সর্ব অভিলাষ।

প্রায়ই এই গান তিনি গেয়েছেন। অতঃপর আমারও মুখস্থ হয়ে যায়।

ভেরি গ্রেসফুল দম্পত্তি। গ্যারাজে আদ্যিকালের অস্টিন। মাঝেমধ্যে ওতে চেপে তাঁরা হয়তো ঢাকুরিয়া-যাদবপুর ইত্যাদি এলাকায় চক্কর কেটে আসতেন। এই নিয়ে আমার বামপন্থী কাকার তির্যক মন্তব্য এবং একটা অদ্ভুত সম্বোধন শুনে আমি নীরবে বিষণ্ণ হয়েছি। স্বপনবুড়োর 'পাততাড়ি' পাতায় আমার যেদিন একটা ছড়া ছাপা হলো, 'যুগান্তর' পত্রিকাটি নিয়ে সবার আগে আমি ছুটলাম ডালিম জ্যেঠুর কাছে। অজস্র আদর পেয়েছি সেদিন তাঁদের কাছ থেকে। সেই ডালিম জ্যেঠুকে সেদিন দেখলাম প্রায় পাগল হয়ে যেতে। যেন একটা বিশাল বিস্ফোরণ ঘটেছে সেদিন কলকাতার বুকে। তা এমন এক ঘটনা, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম বাঙালির মনে রাখা উচিত ছিল। অন্য অনেক ঘটনার চেয়ে এর জার্ক করবার শক্তি অনেক বেশি। রাতগুলির হওয়ার কথা ছিল বিনিদ্র, অপরাধীদের উত্যক্ত করবার জন্য প্রস্তুতিও নেবার কথা ছিল এই জাতির। কার্যত তা হয়নি বলেই আজ জীবনের এই শেষ পর্বে পৌঁছে আত্মগ্লানির সঙ্গে প্রশ্ন করি নিজেকে, 'আমরা বাঙালিরা কি সত্যি এক মরণাপন্ন জাতি? অন্যথায়, আজও কেন আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রত্যুত্তর দিতে পারিনি? কোনো স্থূল ঝামেলা তৈরির কথা বলছি না। বলছি আত্মিক ও সুচিন্তিত মানসিক উদ্ধারের কথা। ২৪ জুন, ১৯৫৩, বাঙালিকে যে পন্থায় ছুরিবিদ্ধ করা হয়েছিল, অন্তত এত বছর অতীত হয়ে যাওয়ার পর তার একটা রাজনৈতিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময় হতে পারে না?'

সেইদিন কাশ্মীরে শেখ আব্দুল্লার কয়েদখানায় রহস্যজনক মৃত্যু বাঙালির নয়নের মণি ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শ্যামাপ্রসাদের জননী যোগমায়া দেবী প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর কাছে লেখা তাঁর চিঠিতে যে প্রশ্ন তুলেছিলেন, তার কোনো সদুত্তর আমরা আজ অবধি পাইনি। আজ অবধি কতজন 'ভারত রত্ন' খেতাব পেলেন, ড. শ্যামাপ্রসাদের নাম একবারও উদ্যোক্তাদের মাথায় এল না? ৩৭০ ধারা অক্ষয় হয়েই আছে। বড় লজ্জা আমাদের!

সেইদিন ছোট বালক আমি স্কুলে যাব বলে বগলে বই নিয়ে বের হয়েছি। হালতুর পথে দেখলাম কিছু মানুষের জটলা। শোকার্ত মানুষগুলির দৃষ্টি শূন্যতায় ভরপুর নীল আকাশের দিকে। একজনও অন্যমনস্ক নন। বেশিক্ষণ এভাবে ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকা কষ্টকর। তবুও তাঁরা ঘাড় নামাননি। এক সময়ে একটি কালো বিন্দুকে দেখা গেল। তাঁরা তখন উত্তেজিত— ওই, ওই যে সেই বিমান, যা বহন করে আনছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মরদেহ। থরথর করে কাঁপছেন বহু মানুষ। তাঁদের জীবন থেকে যাবতীয় উল্লাস, হাসি-ঠাট্টা মিলিয়ে যাবার মুহূর্ত এসে গিয়েছে।

এবং ঠিক সেইক্ষণেই কলরব। যা দেখলাম, আমাকে তা বিশেষভাবে বিচলিত করে। ডালিম জ্যেঠুকে জনা তিনেক লোক জড়িয়ে ধরে আছেন। একজন জ্যেঠার হাত থেকে পিস্তলটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করছেন। যদি তিনি না পারেন, নিজের কপাল ভেদ করে আত্মহত্যা করবেন জ্যেঠা। আমরা সকলে ফরিয়াদি। আমিও। না, না, না...মন্ত্রোপম স্বর তুলে আমিও ছুটলাম তাঁকে নিরস্ত করতে। বাঙালি কী একেবার ভুলে গিয়েছে সেই উত্তাল মুহূর্তগুলিকে? যদি ভুলে গিয়ে থাকে আজ আবার তারা স্মরণ করুক এবং উচ্চারণে নিয়ে আসুক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাকে সামান্য বদলে দিয়ে—

'জাতিকে যারা দিয়েছিল বিষ
মহাপ্রাণ নিয়েছিল কেড়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো
হে পুরুষ ধ্বংস করো তারে।'

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

ভারতভূমির জীবনদর্শন

গুরুপ্রসাদ বিশ্বাস

সমকালীন পৃথিবীতে অসংখ্য নারী। প্রাণী হিসেবে শুধু মনুষ্য প্রজাতিকে ধরেই তার সংখ্যা অনিরূপ্য। তার মধ্যে একজনই মাত্র আমার মা। আমি তাঁর অন্তরেই জন্মেছি, আমাকে তিনি নির্মাণ করেছেন, রক্ষা করেছেন। এই মহাশূন্যলোকে অগণিত গ্রহ নক্ষত্র, তাদের মধ্যেই এ পৃথিবী একটামাত্র এবং তার সামান্য একটু ভূমিতে আমি স্থান পেয়েছি, সেই ভূমিখণ্ডটুকুর স্থল আমার আশ্রয়, জলে আমার জীবন এবং সেখানে উপজাত ফল ও ফসলে নির্মিত আমার দেহ, পরিণত আমার প্রাণ। সেই জন্যই এই ভূমিখণ্ডটুকুই আমার মাতৃভূমি।

আমি আমার জীবনের জন্যে জন্মদাত্রী মায়ের কাছে যেমন কৃতজ্ঞ সমানভাবেই কৃতজ্ঞ আমার জন্মভূমির কাছেও এবং 'মানুষ' (মনুষ্যত্ব আছে এমন এক প্রাণী) বলেই মা-র কাছে আমার ঋণ যেমন আজীবন, মাতৃভূমির কাছেও আমৃত্যু। এই ঋণ অপরিশোধ্য। মনুষ্যেতর কোনো প্রাণী এই ঋণ সম্পর্কে বোধহীন। কারণ তারা সীমাবদ্ধ অধিকার নিয়েই জন্মায়, তাই তাদের পালন করবার দায় থাকে না জন্মদাতার; জন্মদাত্রীর প্রতিপালনের প্রাকৃতিক দায়ও একান্তই সীমাবদ্ধ। তাই তাদের রিরংসাপ্রেরিত উপজাতসমূহও জন্মের ক'দিন বাদেই উৎসের সম্পর্ক রহিত।

প্রাণী হিসেবে একমাত্র মানুষই সৃজনশীল চিন্তার অধিকারী। সূক্ষ্মবোধ যোগে ভারতীয় দর্শন বুঝেছে মানুষ পরমশক্তির অনেকটা অংশভাগী; অতএব অবশ্যই 'সোহম'। তার ধারণা আছে, সেই ধারণা পরিমার্জিত এবং সুপরিণত করবার জন্যে ধ্যান আছে। ধ্যান জ্ঞানকে ঋদ্ধ করে। স্বভাবতই ভারতের মানুষ মাতৃভূমির ঋণ স্বীকারে দায়বদ্ধ। সে মাতৃভূমির প্রতি দায়বদ্ধ। তাই তার দায় তার মাতৃভূমির নদী, বন, জীবনকে পুষ্ট রাখবার জন্যে সহায়ক প্রাণী ও বৃক্ষদের প্রতিও তার দায়িত্ব কৃতজ্ঞতা ও বৌদ্ধিক উৎকর্ষ। সেই কারণেই তার কাছে বৃক্ষ পূজ্য, গৃহপালিত দুগ্ধদ গাভীও মাতৃরূপে সম্বোধিত।

এই বিশাল বিশ্বের সুবিস্তীর্ণ ভূমির মাধুর্য এই যে এর প্রতি সামান্য অংশেই কিছু কিছু পার্থক্য এবং সে পার্থক্য বৃক্ষে, ফলে, পুষ্পে সর্বত্রই স্পষ্ট এবং পরিলক্ষিত। মানুষের বাক্‌ধারা, আচার আচরণেও সে পার্থক্য প্রাকৃতিক। পার্থক্য সামান্য দূরত্বে প্রচ্ছন্ন, বেশি দূরত্বে প্রকট। তাই ভূমির অবস্থান অনুসারে আচরণগত তারতম্য নানা প্রকার জীবন ও ভাবনা আপন সমাজ গড়ে তোলে। সমাজ গড়ে তোলে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি গড়ে রীতিনীতি, জীবন চলনের ধারা। আঞ্চলিক ভিত্তিতে মুখের ভাষা ও মনের ভাব এবং আচার-আচরণে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার ব্যবধান দূরতিক্রম্য। দেশ অনুসারে বেশ, দেশের ভূমি সন্তানদেরও গড়ে ওঠে নিজস্ব ভাবনা। সেই ভাবনা একান্তভাবেই ভূপ্রকৃতি নির্ভর বলে পরম্পরা বাহিত, দেশের নদীর জলধারার মতো মনুষ্য প্রজন্মবাহিত। সেই কারণেই মাতৃভূমিকে আমি শ্রদ্ধা ও সম্মান করি। শ্রদ্ধা ও সম্মান আমার মা এবং পূর্বপুরুষদের প্রতি। সেই অচেনা অজানা পূর্বজোর প্রতি যিনি প্রথম খাদ্যজ ফসলটি চিনেছিলেন, আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন।

এই কারণেই আমি স্বদেশপ্রেমিক, স্ব-সংস্কৃতিপ্রেমিক। আমি অবশ্যই জাতীয়তাবাদী কারণ আমার এই স্বদেশবাসী পূর্বজরা আপন কেন্দ্রীয় ভূমিতে বাস করেও ভাবতেন এবং প্রার্থনা করেছেন, ''সর্বে সুখীনা সন্তঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া। সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু।'' তাঁদের মধ্যে ছিল না কোনো সংকীর্ণতা, মনে ছিল না কোনো প্রকারের বিদ্বেষ। তাঁরা জীবলোক বুঝতেন। শুধুমাত্র মানুষই সুখী থাকত তা ছিল না। আমাদের এই ভূমির জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল মানুষের বিজ্ঞানের মতো, বহু জ্ঞানঋদ্ধ চিন্তকের পরম্পরা যোগে। ঈশ্বর অর্থাৎ এই ব্রহ্মাণ্ডলোকের চালক ও অনুঘটক যে মহাশক্তি, মুনিঋষিরা জেনেছেন সে শক্তি অবাঙ্মানসগোচর। স্বাভাবিক ভাবেই নিরাকার। তবু যেহেতু এই তত্ত্বজ্ঞান আমজনতার বোধাতীত তাই পরম ঔদার্যে বলেছেন, সেই পরমশক্তিকে যে যেভাবে ভাবে ভাবুক, তার বুদ্ধি তাঁকে যেমন দেখে দেখুক তাতে ঈশ্বরের কিছু যায় আসে না বরং ''যদৃশীভাবনার্যস্য সিদ্ধি তাদৃশীভবতি''। যেভাবেই ভাবুক তাতেই তার সিদ্ধি। কত প্রাণী তাঁর সৃষ্টি তালিকায় আছে যারা ঈশ্বর বা স্রষ্টা সম্পর্কে অসচেতন, তারাও তো আছে। কারণ সৃষ্টিতেই তাঁর আনন্দ। তিনি যে নিরাকার, নির্বিকার, তাঁর না আছে বিরাগ, না বিরূপতা।

ঈশ্বর সম্পর্কে এই বোধ এবং জ্ঞান ও চিন্তা ভারতীয় জীবনে বৈরাগ্যের প্রেরণা। বৈরাগ্য এক প্রীতমূলক উদাসীনতা। এই উদাসীনতার পরম প্রকাশ বা রূপই হলো সন্ন্যাস। ভারতবর্ষের স্বকীয় চিন্তাজাত এই সন্ন্যাসের সঙ্গে বিশ্বের অন্য কোনো ঈশ্বর উপাসকদের মেলে না। সন্ন্যাস অর্থ ব্যক্তি বা সমষ্টিস্বার্থ সম্পর্কিত সব অনুভূতি বিসর্জন দিয়ে ঈশ্বরোপাসনা বা তপস্যা যা লব্ধপ্রাণকে মহত্তম বিন্দুতে পৌঁছে দিতে পারে। এই ভাবনা বা বোধ একান্তভাবেই এদেশেজাত বলে গৌতমবুদ্ধ নিরীশ্বরবাদী হোন বা ঈশ্বর সম্পর্কে উদাসীন হোন তিনিও এই মহাব্রতকেই জীবন ও ভাবনার সারমর্ম করে নিয়েছিলেন যার নাম সন্ন্যাস। কিন্তু কালানুক্রমিক জ্ঞান মানুষকে যে বিজ্ঞান দিয়েছে সেখানে নানা বস্তুর উৎপাদন সম্পদভাগে অনুপ্রাণিত করে তুলেছে মানুষকে। ফলে মানুষ ত্যাগের শান্তি ত্যাগ করে ভোগের অতৃপ্তিকেই বরণীয় করে নিচ্ছে। ফলে ভোগ ভোগস্পৃহাকে বাড়িয়ে মনুষ্যজীবনের সঙ্গে মনুষ্যেতর প্রাণীদের জীবনধারাতে যে বিপুল পার্থক্য তা দিচ্ছে ঘুচিয়ে। দিনে দিনে সাধারণজনেদের বুদ্ধির স্তর যেন মাটি চাপা পড়ে তার ওপর গজিয়ে উঠছে অসংখ্য বিষাক্ত পত্রগুল্ম। সেই ভোগোস্পৃহার জন্যেই তীব্র অর্থলিপ্সা। অর্থলিপ্সার জন্যে ক্ষমতা লিপ্সা ক্রমান্বয়ে প্রসারমান। ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষা এবং লোভ ও লালসা মনুষ্যোচিত সব গুণ বিনষ্টি ঘটায়। এই দেশে সেই বিষয়টিই প্রসারমান।

আমাদের দেশ সহস্রাধিক বৎসর পূর্ণরূপে পরাধীন থাকবার কারণে এবং দেশের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা না হবার ফলে প্রায় চল্লিশ প্রজন্মব্যাপী পরাধীনতা আমাদের রক্ত-অস্থি-মজ্জায় দাসত্ব এবং ধমনীবাহী রক্তে ভীতির সঞ্চার করে ফেলেছে বলে আমরা আমাদের সংস্কৃতিকে পুনঃসঞ্জীবিত করতে ভয় পাই। আমাদের প্রসারিত উৎপাদনমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ধনার্জনে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীবৃন্দ গৈরিক বর্ণ দেখলে আঁতকে ওঠে। ভারতীয়ত্ব শব্দ কানে গেলেই ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়ে। স্বদেশীয় ভাবনাকে যদি কালোপযোগী ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা দেবার কথা উত্থাপন করা যায় অমনি বোধহীন বুদ্ধিজীবীবৃন্দ শিবাস্বর নিক্ষেপে শূন্যমণ্ডল বিদীর্ণ করতে থাকে গেল গেল সব রসাতলে গেল—গেরুয়া এল, সব গৈরিকীকরণ হয়ে গেল। সর্বনাশ বুঝি ঘটে গেল তাদের। কি গেল মশাই? কি হলো, অমন আর্তনাদ করছেন কেন?

উত্তর মেলে না। কি উত্তর হবে জানা নেই তো? শেখা হয়নি। বুদ্ধিজীবী তো পরবুদ্ধিনির্ভর প্রাণী। দশটা বই পড়ে জোড়াতালি দিয়ে বই লেখা বা যে কোনো রাজনৈতিক দলের আনুগত্যে যোগ্যতা যাচাই বিনা উচ্চপদপ্রাপ্তি, তারপর আখের গোছানো। কাজেই যতটুকু দীক্ষা সেটুকুই তো শিক্ষা। সেই শিক্ষাতে স্বদেশ সম্পর্কে সহমর্মিতা বা দেশের প্রকৃত শিক্ষার পুনরুজ্জীবন করবার বোধ সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। বরং কেউ যদি সেসব কথা বলে তবে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবার ঐকান্তিক চেষ্টা বিদেশীভাবনা ও সংস্কৃতির দাসেদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তা না করলে তাদের প্রভুদের ভারতরাষ্ট্র দখলে রাখবার একচেটিয়া কারবার বন্ধ হয়ে যেতেই পারে। সেটা রক্ষা করাই বুদ্ধিজীবী তকমা পাওয়া অবশ্য কর্ম। তাই কখনো বা তারা সামান্য ছলছুতো তৈরি করে দেশপ্রেমিক সংগঠনকে হেনস্থা করবার। তাকেই মূলধন এবং সুযোগ করে নিয়ে কখনও তারা করে সরকারি সম্মান প্রত্যাহার, আবার কখনও মূর্খের অবোধ বিকারে তার পিতৃপুরুষগণের অবমাননা করে তাঁদের অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে মুখ্যব্যাদান করে যার দুগ্ধপান করে জীবনধারণ তারই মাংস ভক্ষণকে শ্লাঘার কাজ হিসেবে প্রচার করে। ■

প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে গুগলের চাকুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অন্ধ্র প্রদেশের গোদাবরী নদীর তীরে তিপাড়ু নামের এক অখ্যাত গ্রামের এক অখ্যাত বালক। নরেশ কারাটুরা। বাবা প্রসাদ, পেশায় লরিচালক, মা কুমারী একজন গৃহিণী। ছোট্ট নরেশ ছোটো থেকেই বড় দুষ্টু কিন্তু প্রাণবন্ত। গ্রামেরই অতি সাধারণ মানের স্কুলে পড়াশুনা করে সে। ক্লাসে বসে শিক্ষকের দেওয়া কাজ সবার আগে শেষ করে শিক্ষকের কোলেই ঘুমিয়ে পড়ে। দুরন্ত হলে কী হবে তার মিষ্টি ব্যবহারের জন্য সে সকলেরই আদরের। কিন্তু তার এই দুরন্ত শৈশব হঠাৎই স্তব্ধ হয়ে যায় ১৯৯৩ সালের ১১ জানুয়ারির একটি মারাত্মক দুর্ঘটনায়। সেদিন সংক্রান্তির ছুটিতে সে আর তার দিদি তাদের মায়ের সঙ্গে কাছেরই গ্রামে গিয়েছিল একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। সেখান থেকে ফেরার সময় বাস না থাকায় খানিকটা বাধ্য হয়েই কুমারী, স্বামীর বন্ধুর লরিতে করে ছেলেমেয়েকে নিয়ে ফিরছিলেন। মায়ের পাশে বসে নরেশ ক্রমাগত লরির কেবিনের দরজার হুড়কো (ল্যাচ) নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকায় বেকায়দায় দরজাটা খুলে যায় এবং নরেশ ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে লরি থেকে বেরোনো একটি লোহার রডে তার পা কেটে যায়। একটি বড় বেসরকারি হাসপাতালের সামনে এই ঘটনাটা ঘটলেও তারা ওই সঙ্কটাপন্ন ছোট্ট ছেলেটিকে ভর্তি নেয়নি কেবলমাত্র 'অ্যাকসিডেন্ট কেস'-এর অজুহাতে। ভাগ্য সহায়— ঠিক সেই সময়ই সেখান দিয়ে একজন কনস্টেবল যাচ্ছিলেন, যিনি তাকে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করে দেন। সেখানে তার থেঁতলে যাওয়া অন্ত্রের অপারেশন করা হয় ও পা দুটির ক্ষতস্থানকে ব্যান্ডেজ দিয়ে বেঁধে রাখা হয়। কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই তার পায়ের ক্ষতে পচন শুরু হলে কোমরের নিচ থেকেই তার দুটি পা কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়। অপারেশন শেষে জ্ঞান ফিরে আসার পর সাত-আট বছরের ছোট্ট ছেলেটি তার মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, ''মা আমার পা-দুটো কই?'' তখন তার মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। নরেশ কিন্তু এত ছোটো বয়সে এই কঠিন আঘাতেও ভেঙে পড়েনি। সে কখনও মনে করেনি ওই দুর্ঘটনা তার জীবনকে রাতারাতি পালটে ফেলেছে। বরং এত আঘাতের পরেও ঈশ্বরের প্রতি আস্থা অটুট রেখে আর পাঁচটা বন্ধুদের সঙ্গেই মিলেমিশে বড় হতে থাকে সে। ওই দুর্ঘটনার পর নরেশের পরিবার তানুকু শহরে চলে আসে এবং সেখানে একটি মিশনারি স্কুলে নরেশ ভর্তি হয়। প্রতিবন্ধী হয়ে যাওয়া ভাইকে বিদ্যালয়ে দেখভালের জন্য তার দিদিকে দু'বছরের বড় হওয়া সত্ত্বেও একই ক্লাসে ভর্তি হতে হয়। তারপর আর ফিরে তাকাতে হয়নি। উচ্চমেধার এই ছেলে দশম শ্রেণীতে বোর্ডের পরীক্ষায় ৬০০ নম্বরের মধ্যে ৫৪২ নম্বর পেয়ে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে এবং আই আই টি জে-ই-ই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। সমগ্র ভারতবর্ষের নিরিখে ৯৯২ র‍্যাঙ্ক ও প্রতিবন্ধী ক্যাটেগরিতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে আই আই টি মাদ্রাজে ভর্তি হয়। আই আই টি এই কৃতী ছাত্রের জন্য লিফট এবং র‍্যাম্পেরও ব্যবস্থা করে দেয়। জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পথে চেনা-অচেনা বহু ব্যক্তি তাকে সহায়তা করেছে। আই আই টি-র ডিন অধ্যাপক ইডিচ্যানডি তাকে পাওয়ারড্ হুইল চেয়ার দিয়ে সাহায্য করেন। তাছাড়া তার পরীক্ষায় প্রাপ্ত উচ্চ নম্বরের জন্য বছর প্রতি ৫০ হাজার অর্থমূল্য বেতনের গোথাম জুনিয়র কলেজে বিনা বেতনে পড়াশুনা করেছে সে। এক্ষেত্রেও ভাগ্য তার এতটাই সহায় যে যখন সে আই আই টি-র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র ঠিক সেইসময় একদিন বন্ধুদের সঙ্গে ট্রেনে করে একটি কনফারেন্সে যোগ দিতে যাওয়ার সময় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। পরবর্তীকালে তিনি নরেশদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা জানার পর তার হস্টেলের যাবতীয় ব্যয় বহন করেন। অদৃষ্ট নরেশকে একদিক থেকে দুর্বল বানালেও স্বাবলম্বী হওয়ার পথে ব্যক্তিগত ভাবে এবং পড়াশুনার ক্ষেত্রেও অনেক ভালো মানুষের সান্নিধ্য ও সাহায্য পেয়েছে সে। তবে এত উচ্চ মেধা থাকা সত্ত্বেও সে পি এইচ ডি করার কথা এখনও ভাবেনি। আপাত লক্ষ্য তার জীবনসংগ্রামের সঙ্গী বাবা মাকে একটু বিশ্রাম দেওয়া। তাই ক্যাম্পাসিং-এ আসা বিভিন্ন কোম্পানির মধ্যে মরগ্যান স্টানলি তাকেই প্রথম নির্বাচিত করা সত্ত্বেও সে গুগ্‌ল-এ যোগ দেয়। কারণ সে পুরোপুরিভাবেই কম্পিউটার সায়েন্স, অ্যালগেরিদম এবং গেম থিওরি নিয়ে কাজ করতে ইচ্ছুক।

এক অনামা অশিক্ষিত লরি চালকের ছেলের হার না মানার অদম্য ইচ্ছাকে পাথেয় করে আপন প্রতিভাবলে শীর্ষে পৌঁছনো, তা কোনোমতেই রূপকথার গল্পের চেয়ে কম রোমাঞ্চ নয়। কম অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনাও নয় আমাদের চারপাশে লড়ে যাওয়া লড়াকু প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর জন্য।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৮১০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

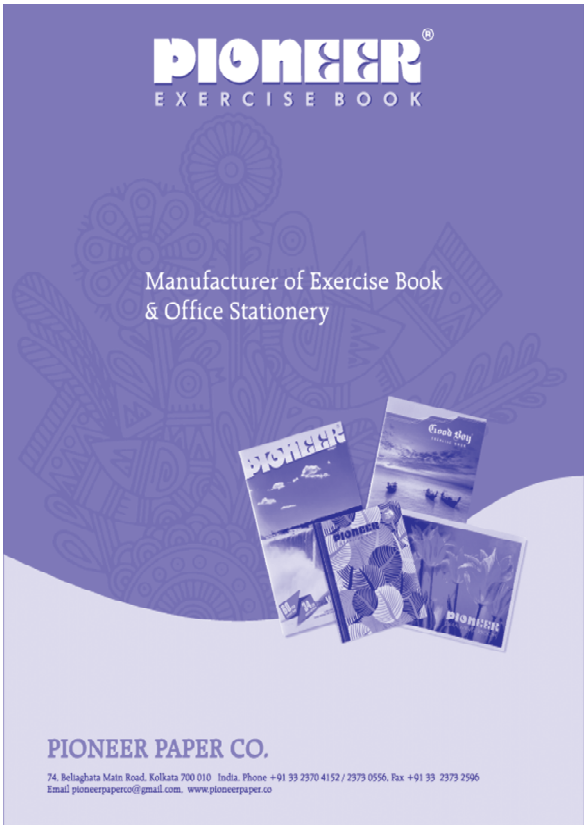

'সকলেই আমরা জানি, ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শিক্ষার উপর। তাই বলে শিল্প এবং বাণিজ্য অপ্রয়োজনীয় বিষয় নয়। কিন্তু শিক্ষিত মানুষের পক্ষে সবই করা সম্ভব, অশিক্ষিতের পক্ষে কিছুই নয়।'

— ভগিনী নিবেদিতা

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

মানুষ খারাপ কাজ করে কেন?

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক এম.ডি. (হোমিও)

মানুষ দুই ধরনের— স্ত্রী ও পুরুষ, আবার কাজের নিরিখে মানুষকে দু'ভাগে ভাগ করা হয় যিনি ভাল কাজ করেন তিনি ভাল মানুষ। যিনি খারাপ কাজ করেন তিনি খারাপ মানুষ। কেন মানুষ ভাল কাজ করে? কেনই বা মানুষ খারাপ কাজ করে? এর প্রকৃতি উৎস অনুসন্ধান করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও শরীর বিজ্ঞানের বহু তথ্য ও তত্ত্ব উঠে এসেছে। যেমন, ক্রিমিনাল মাইন্ড ও ক্রিয়েটিভ মাইন্ড।

মনোবিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান বলছে, অনুভূতি আমাদের যা করায় আমরা তাই করি বা করতে বাধ্য হই। মনোবিজ্ঞানে এই অনুভূতির গুরুত্ব অপরিসীম। শিশুকাল থেকে বেড়ে ওঠা, মায়ের সান্নিধ্য থেকে স্বনির্ভর হয়ে ওঠার লড়াইয়ে শিশুকে বৃদ্ধি ও বিকাশের নানা স্তর অতিক্রম করতে হয়। শিশু বোঝে সে সবসময় যা চায় তা পাওয়া অসম্ভব। তার মধ্যে জন্ম নেয় 'বোধ'। এই অতৃপ্ত বাসনা অতি সক্রিয় হলে সেই ব্যক্তির চরিত্রে আনে ভারসাম্যহীনতা। তৈরি হয় বিকৃত ব্যক্তিত্ব। আবার অতি কঠোর নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিতেও বাস্তববোধের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষ ঘটে। কিছু ব্যক্তিত্ব বিকার (Personality disorder) মানুষের প্রসঙ্গে এসে যোগ হয়। যেমন সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্ব। সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তিত্ব। যৌন বিকৃতি। বিশেষ করে ধর্ষকামী (Sadist)। শিশুদের এরকম বহু অতৃপ্তের অভিজ্ঞতায় মানুষের মধ্যে জন্মায় হীনমন্যতা বোধ। এই বোধের ঘাটতি পূরণে কেউ কেউ নিজেদের সত্ত্বাকে অতিরঞ্জিত করে দেখেন। তখন তাঁদের যা তা চাই-ই চাই। যাঁরা নিজের প্রকৃত সত্ত্বাকে অগ্রাহ্য করে 'আমি' কে নিপুণ ভাবে চালনা করে সঠিক পথে বৃহত্তরের সঙ্গে একান্ত হতে পারে না, তাঁরা ব্যর্থ-বিভ্রান্ত। তাঁদের জন্য খোলা থাকে অনৈতিক ও ধ্বংসের পথ। নিজের মাহাত্ম্যের উল্লেখই হলো এদের জয়। আবার মিডিয়ায় প্রভাব ও সোজাসুজিভাবে পড়ছে মানুষের জীবনে। পণ্য সামগ্রীর বিজ্ঞাপনে নানা বিকৃত

অঙ্গভঙ্গি, শিল্পের নামে ভায়োলেন্স মানুষের আদিম প্রবৃত্তির উস্কানির কাজ করছে। আমাদের চারপাশে নিত্যদিন কত খুনোখুনি মারামারি ঘটনা ঘটছে। আমরা হয়ত জানিই না এর পিছনে মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকার (Personality disorder) এর ভূমিকা।

শৈশবের অভিজ্ঞতা মানুষ ভুলতে চাইলেও পারে না। আর পারে না বলেই তার একান্ত নিজস্ব নিপুণতায় সেই অভিজ্ঞতা সমূহ সেজে ওঠে ও পরিবেশিত হয়। কিছু শারীরতত্ত্ববিদ বলেন ব্যক্তির সৃজনশীলতা বা অপরাধ প্রবণতা বংশগত। খেলা বা শিল্পচর্চায় বংশ পরম্পরার যোগ্যতা থাকেই। জিন ঘটিত কারণে মানুষ অপরাধী হয় বলে মনে করেন। বংশ পরম্পরায় এটি সন্তানে পরিচালিত হয়। তাই পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই সাধারণত প্রকাশ পায় পুত্রে।

তথ্য আবেগ অনুভূতির সঙ্গে মিশে মস্তিষ্কের সামনের অংশে যে প্রিফ্রন্ট্রাল লোবের যথার্থ বিচার বিশ্লেষণে ও পরিকল্পনা সৃষ্টি যোগ্য হয়ে ওঠে। এটা দেখা গিয়েছে ইতিবাচক আবেগ নার্ভের মধ্যে খবর আদান প্রদান ও সংহতি তরান্বিত হয়। তবে কি পিছনে কেবলই নার্ভের ভূমিকা, তাহলে তো আর পাঁচটা ভালো শিল্প ও সৃজনীশক্তিকে এক করে দেখা হবে। আসলে সৃজনশীলতা একটু অন্য মানের। এতে থাকে স্রষ্টার 'স্পেশাল টেকনিক' বা অভিনবত্বের ছোঁয়া। সকলেই পিকাসো বা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি হতে পারেন না।

শরীরতত্ত্ব অনুসারে শরীরে ভিটামিনের (বি) অভাব খাদ্যের প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট ভারসাম্যের অভাব। হরমোনের প্রভাব, সীসা দূষণ, মস্তিষ্কে আঘাত বা টিউমার প্রভৃতি বহু কারণে অপরাধীর জন্ম হয়। আবার সমাজ বিজ্ঞানীদের একাংশ ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র গঠনে পরিবার ও সমাজের অবদানকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন। অনেকে অপরাধের জন্য মূলত তাঁর শ্রেণী-বৈষম্য ও শ্রেণী সংগ্রামকেই দায়ী করেছেন, অন্য দল গবেষকের মতে মানুষ ক্রিমিনাল হয়ে জন্মায় না বরং পরিবেশ পরিস্থিতিই তাঁকে অপরাধী তৈরি করে। অপরদিকে বংশ পরম্পরার ব্যাপারে পিতার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের অবদান আছে। কারণ পিতার ঔরসে মাতার গর্ভে সন্তান ২৮০ দিন থেকে মানুষ রূপ পায়। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, একজন 'মা' একশো জন শিক্ষকের থেকে বেশি। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান বলেছেন—"তোমরা একশোজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি উপহার দেব।" কারণ একজন মা পারেন তাঁর সন্তানকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে। মায়ের মায়াবী মুখ, আদর, ভালোবাসা, স্নেহ মমতা, মায়ের কাছে থেকে পাওয়া আনন্দ ও শিক্ষা, ভবিষ্যতে সুস্থ মানুষ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(লেখক একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন হোমিও চিকিৎসক)

বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব

পূর্বাঞ্চল বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের কলকাতা-হাওড়া মহানগর সমিতির ৩৩ তম বার্ষিক উৎসব গত ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার কলামন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য, বনবাসী সমাজের বিকাশ এবং সংস্কৃতি রক্ষায় সমর্পিত এই সংগঠন তার ৬৩ বছরের যাত্রায় শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কার জল সংরক্ষণ, স্বাবলম্বন ও বিভিন্ন প্রকল্প দ্বারা বনবাসী

সমাবেশ সমাচার

সমাজে আশার আলো জ্বালিয়েছে।

অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে প্রখ্যাত শিল্পপতিও গোভক্ত দীনদয়াল গুপ্ত এবং প্রধান অতিথি রূপে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মোহনলাল বাজাজ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তারূপে সংগঠনের অখিল ভারতীয় সহ মহিলা প্রমুখ শ্রীমতী রঞ্জনা করন্দীকর সবাইকে বনবাসী সমাজের সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। শেষে রাজকুমার জৈন নির্দেশিত নাটক 'জাগরণ' মঞ্চস্থ হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিয়া বৈদ্য।

শ্রুতি নাট্যোৎসব

গত ২৯ নভেম্বর মেদিনীপুর শহরে শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য স্মৃতি সদনে আকাশবাণী কলকাতা প্রযোজিত 'শ্রুতি' নাট্যোৎসব একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হলো। আকাশবাণীর পক্ষ থেকে বিনামূল্যে প্রবেশপত্র বিতরণ করা হয়।

শুভেন্দু মাইতির পরিচালনায় লালন আকাদেমির শিল্পীরা ছয়টি লোকনাট্য গীতি পরিবেশন করেন। জলপাইগুড়ির ভাওয়াইয়া গান, মালদহের গম্ভীরা গান এবং মুর্শিদাবাদের আলকাপ গান উপস্থিত দর্শকমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। শেষে ষড়ভুজ নাট্যগোষ্ঠী তরুণ প্রধানের নির্দেশনায় 'জঠর যুদ্ধ' নামে শ্রুতি নাটক পরিবেশন করে। শাসকদল নেতা, মস্তানরাজ ও গ্রাম্য পুরোহিত এই ত্রয়ীর সাঁড়াশী আক্রমণে দরিদ্র গ্রামবাসী গুহরামের করুণ পরিণতি (তার গাভিন ছাগল ও গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু) এই শ্রুতি নাটকের উপজীব্য। আকাশবাণীর উপস্থাপক কৌশিক সেন সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে ও মধ্যে তিনি শ্রোতাদের মধ্য থেকে আকাশবাণীর অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চান। তিনি তিনটি ভিন্ন স্বাদের কবিতা আবৃত্তি করেন।

শ্রদ্ধানিধি

পুরুলিয়া নগরের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সাপ্তাহিক সম্মেলনের স্বয়ংসেবক এবং বিশিষ্ট দন্ত চিকিৎসক ডাঃ সৌম্যদীপ সাহা তাঁর পিতামহ ব্রজকিশোর সাহার স্মরণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সেবাবিভাগ পরিচালিত সেবা কাজের জন্য শ্রদ্ধানিধি অর্পণ করেন। সংগঠনের সভাপতি বদ্রীনারায়ণ পাণ্ডের হাতে তিনি এই শ্রদ্ধানিধি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সেবা প্রমুখ সুনীল চন্দ্র কর। ব্রজকিশোর সাহা গত ২০ নভেম্বর স্বর্গগত হন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ১০৬ বৎসর। তিনি প্রথম জীবনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার সময় তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন। তিনি দুই পুত্র এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন বর্তমান পুরুলিয়া জেলার বরিষ্ঠতম নাগরিক।

শোকসংবাদ

গত ২২ নভেম্বর হাওড়া জেলার ডোমজুড় খণ্ডের বেগড়ী শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক চণ্ডীদাস ব্যানার্জী ৮৩ বছর বয়সে নিজ বাসগৃহে পরলোক গমন করেন। চণ্ডীবাবু হিন্দু মহাসভা, জনসঙ্ঘ এবং পরে ভারতীয় জনতা পার্টির সক্রিয় কর্মী ছিলেন। একাত্মতা যাত্রা এবং রামমন্দির আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, দুই পুত্রবধূ, কন্যা-জামাতা এবং নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। নিজ এলাকায় সঙ্ঘকাজ প্রসারে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য।

***

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা শাখার স্বয়ংসেবক কৃশানু মিত্র-র পিতা প্রবীর কুমার মিত্র গত ৩ আগস্ট শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। স্ত্রী ও দুই পুত্রকে তিনি রেখে গেছেন।

***

মালদা জেলার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সদর মহকুমা কার্যবাহ পবিত্র গুপ্তের বাবা শ্যামাপদ গুপ্ত গত ৬ ডিসেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বালিগঞ্জ মুরলীধর বালিকা মহাবিদ্যালয় ও বর্ধমান বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির

কলকাতার বালিগঞ্জে মুরলীধর বালিকা মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির। মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের উদ্যোগে সংস্কৃতভারতীর কলকাতা শাখার সহযোগিতায় এই শিবির চলতে থাকে। শিবিরের শিক্ষক ছিলেন সংস্কৃতভারতীর কার্যকর্তা নাড়ুগোপাল মণ্ডল। দশদিন ধরে চলা এই শিবিরে মহাবিদ্যালয়ের সকল ছাত্রীরা আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। শিবিরের সমাপন কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় গত ১১ নভেম্বর। কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ড. কৃষ্ণা দত্ত ও সংস্কৃতভারতীর কার্যকর্ত্রী সুশীলা বিড়লা হাইস্কুলের শিক্ষিকা শ্রীমতী রক্ষিতা রায়। অনুষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সরস্বতী বন্দনা, দীপপ্রণাম মন্ত্র, সুভাষিতম্, নাটক, শিবিরের অনুভব কথন ইত্যাদি প্রদর্শন করেন। সকল বক্তাই সংস্কৃত ভাষা চর্চা করার জন্য সকলকেই এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বালিগঞ্জের পাশাপাশি বর্ধমান শহরের বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃতভারতীর বর্ধমান শাখার সহযোগিতায় দশদিন ধরে অনুষ্ঠিত হলো সংস্কৃত সম্ভাষণ শিবির। গত ২৬ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই শিবির চলে। মহাবিদ্যালয়ের শতাধিক ছাত্রছাত্রী এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষক হিসাবে পাঠদান করেন সংস্কৃতভারতীর কার্যকর্তা সাধন দেবনাথ ও কমলাকান্ত মিস্ত্রী। মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান ড. সত্যপ্রসাদ মিশ্র জানান, বর্তমানে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সংস্কৃত নিয়ে পড়াশোনার আগ্রহ বেড়েছে এবং অনেক ছাত্রছাত্রী সংস্কৃত নিয়ে গবেষণাও করছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল ড. শিবপ্রসাদ রুদ্র। কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক তথা সংস্কৃতভারতীর বর্ধমান জেলা সভাপতি ড. গৌতম চন্দ্র ও সম্পাদক সুবলসখা ব্রহ্মচারী মহারাজ। সমাপনান্তে মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাত্রছাত্রীদের প্রশংসাপত্র বিতরণ করা হয়।

স্মরণসভা

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বেহালা নগরের স্বয়ংসেবকদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাসীমা প্রয়াত গীতারানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে এক ঘরোয়া স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে তাঁর পরিবার এবং পরিচিতজন তাঁর সম্পর্কে টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণ করেন। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বেহালা নগরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় মাসীমা প্রয়াত গীতারানী বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২২ মে ২০১৪, ৭৫ বছর বয়সে নিজ বাসগৃহে প্রয়াত হন।

সঙ্ঘের আদর্শকে তিনি নিজের আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাই সমস্ত স্বয়ংসেবকদের কাছে তাঁর বাড়ি ছিল অবারিত দ্বার। তাঁর পরিবার হয়ে উঠেছিল সঙ্ঘময়। ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ, একাত্মতা রথযাত্রা,

ডাক্তারজী জন্মশতবার্ষিকী প্রতিটি কার্যক্রমেই তাঁর উৎসাহ ও সহায়তা ছিল উল্লেখযোগ্য। একসময় নিজে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও পাড়া-প্রতিবেশীদের যথাসাধ্য সহায়তা করতেন। বেশ কয়েকজন দুঃস্থ বয়স্ক মহিলা শেষ জীবনে তাঁর কাছে আশ্রয় পেয়েছিলেন।

নিজে প্রথাগত শিক্ষার সুযোগ না পাওয়া সত্ত্বেও আজ থেকে প্রায় ৫০ বছর আগে এতদঞ্চলের বহু ছেলেমেয়ের সাক্ষরতার কাজে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ। সৎ, অতিথিবৎসল, উদার, বিদ্যোৎসাহী আদর্শনিষ্ঠ অথচ অসম্ভব সহিষ্ণু তাঁর জীবন ছিল যেন এক নীরব প্রার্থনা। মৃত্যুকালে তিনি পুত্র-পুত্রবধূ এবং নাতি-নাতনি রেখে গেছেন। তাঁর শেষযাত্রায় অসংখ্য স্বয়ংসেবক ও প্রতিবেশী শবানুগমন করেন।

মঙ্গলনিধি

গত ২৯ নভেম্বর, কাঁথি নগরের স্বয়ংসেবক মোহন মুখার্জি ও সুচরিতা মুখার্জির শুভ বিবাহের প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে কাঁথি জেলা প্রচারক স্বপনকুমার প্রামাণিকের হাতে 'মঙ্গলনিধি' প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে জেলা শারীরিক প্রমুখ দীনেশ মাইতি, নগর কার্যবাহ অর্কেন্দু দাস ও অনেক স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

দুর্গাপুরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সচেতনতা শিবির

গত ১৫ নভেম্বর দুর্গাপুর নগরের নীলডাঙ্গা বস্তিতে একটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়। ন্যাশনাল মেডিকো অর্গানাইজেশনের (এন এম ও) কার্যকর্তা ডাঃ তীর্থঙ্কর দেব এবং দুর্গাপুরের একটি মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকের ব্যবস্থাপনায় কলকাতার বিভিন্ন কলেজের ডাক্তারদের উপস্থিতিতে চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়।

গত চারমাস ধরে এই বস্তিতে সেবা বিভাগের দুইটি প্রকল্প চলছে। চিকিৎসা শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ওষুধেরও ব্যবস্থা করা হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতা উপলক্ষে শিশুদের দেখানো হয় খাওয়ার আগে কীভাবে হাত পরিষ্কার করতে হয়। মায়েদের জানানো হয় তার নিজের শরীর এবং পরিবারকে কী করলে রোগের হাত থেকে বাঁচানো যায়।

এখানে ১৬৮ জনের চিকিৎসা করা হয় এবং ওষুধ দেওয়া হয়। রক্ত পরীক্ষা করানো হয় কয়েকজনের। সেবা ভারতীর পক্ষ থেকে প্রদ্যুৎমল বসু এবং শুভাশিস মাজী উপস্থিত ছিলেন। প্রান্ত সেবা প্রমুখ ও দুর্গাপুর নগর কার্যবাহ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত
জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—
২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬
দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

সাম্প্রতিক বাংলা ছবির হালহকিকৎ

বিকাশ ভট্টাচার্য

বেশ কয়েকবছর হলো বাংলা ছবির চরিত্র খানিক বদলেছে। দক্ষিণী ছবির রিমেক থেকে সরে এসে সাহিত্যনির্ভর মৌলিক বিষয় নিয়ে বেশ কিছু বাংলা ছবি আমাদের মুগ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে কৌশিক গাঙ্গুলির 'শব্দ', 'ছোটদের ছবি' যেমন আছে, তেমনি শতরূপা সান্যালের থার্ড জেন্ডার নিয়ে ছবি 'অন্য অপলা', রিংগোর খালেদ হোসেইনির বিখ্যাত কাহিনি 'দ্য কাইট রানার' অবলম্বনে পলিটিক্যাল থ্রিলার 'ঘুড়ি'ও আছে। এই ছবিতে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে চিরন্তন বন্ধুত্বের এক মানবিক দিকও তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া অরিন্দম শীল প্রথম শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে 'এবার শবর' এবং এখন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে বেনারসের পটভূমিকায় রহস্য চিত্র 'হর হর ব্যোমকেশ' করে আমাদের মুগ্ধ করেছে। পুজোর সময় রিলিজ করে অঞ্জন দত্তের ব্যোমকেশ এখনও বক্স অফিসে ভালোই ব্যবসা করছে। এ ছবিতে যিশু সেনগুপ্তর ব্যোমকেশকে সকলের ভালো লেগেছে।

এবার আসন্ন কিছু বাংলা ছবির কথা আলোচনা করি। সন্দীপ রায় প্রতিবছরই বড়দিনের সময় ফেলুদাকে নিয়ে আমাদের সামনে আসেন। এবার ফেলুদা নেই। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা গল্প নিয়ে তিনি ছবি করেছেন 'মনচোরা'। থ্রিলার ধর্মী মিষ্টি প্রেমের কাহিনি। সম্পর্কের ছবি। অভিনয়ে আবীর চট্টোপাধ্যায়, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, রাইমা সেন এবং জুন মালিয়া। সেই সঙ্গে সন্দীপ রায়ের পুরো ইউনিট।

সিনেমাওয়ালা

সম্প্রতি গোয়া চলচ্চিত্র উৎসবে বেশ কিছু বাংলা ছবি ইন্ডিয়ান প্যানারমায় দেখানো হয়েছে। মোট সাতটি। এর মধ্যে কৌশিক গাঙ্গুলির 'সিনেমাওয়ালা' সকলের মন কেড়েছে। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও সোহিনী সরকার অভিনীত এই ছবির জন্য কৌশিক ইউনেস্কোর পুরস্কারস্বরূপ স্বর্ণপদক পেয়েছেন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি এই সম্মানে সম্মানিত হলেন!

বাপ্পাদিত্য-র 'সোহরা ব্রিজ'

সদ্যপ্রয়াত পরিচালক বাপ্পাদিত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্প্রদান', 'শিক্ষান্তর', 'কাঁটাতার' ছবিগুলি বাণিজ্যিক সাফল্য না পেলেও বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে প্রশংসা পেয়েছিল। এ বছরও IFFI-র ইন্ডিয়ান প্যানোরামায় তাঁর সর্বশেষ ছবি 'মোহরা ব্রিজ' প্রশংসিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই ছবিরই সিকোয়েন্সের জন্য চেরাপুঞ্জিতে শুট করতে গিয়ে ক্রমাগত ভিজে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন। এই রোগই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল।

'সিনেমাওয়ালা' ছবির একটি দৃশ্য।

আরশিনগর

১৮ ডিসেম্বর মুক্তি পাওয়ার কথা শেক্সপিয়ারের 'রোমিও জুলিয়েট'-এর ছায়ায় নির্মিত অর্পণা সেনের 'আরশিনগর'। আরশিনগর এমন একটা জায়গা যার কোনো ভৌগোলিক অবস্থান নেই। সকলের মনের ভিতর থাকে এক আরশিনগর, যার ওপর অনেক কিছুর ছায়া পড়ে। সেই ছায়া জমি অধিগ্রহণের, ল্যান্ড মাফিয়াদের যেমন, তেমনই প্রেম- ভালবাসার এবং আরও অনেক কিছুর ছায়া। তথাকথিত বাণিজ্যিক ছবির সফল নায়ক দেবকে এ ছবিতে অন্যভাবে দেখা যাবে। প্রচুর গান আছে। কাওয়ালি, লালন গীতি পাশাপাশি।

গহিন হৃদয়

অনেকদিন পর ছোটপর্দার সফল ডিরেক্টার অগ্নিদেব চট্টোপাধ্যায় বড় পর্দার জন্য ছবি তৈরি করেছেন। প্রয়াত সাহিত্যিক সুচিত্রা ভট্টাচার্যের জনপ্রিয় উপন্যাস 'গহিন হৃদয়'কে নিয়ে এবার তিনি ছবি করেছেন। সোহিনী (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) চাকুরিরতা। স্বামী (দেবশঙ্কর), ন' বছরের ছেলে ও শাশুড়িকে নিয়ে তার ভরা সংসার। কিন্তু এই ভরা সংসার নিয়ে সে সুখী নয়। বিবাহ বহির্ভূত এক অবৈধ সম্পর্কে সে জড়িয়ে পড়ে স্বামীর বন্ধু অনুপমের (কৌশিক সেন) সঙ্গে। সে ঠিক করে অনুপমকে বিয়ে করবে। যেদিন সোহিনী তাঁর স্বামীর কাছে তাঁর বিয়ের সিদ্ধান্তের কথা বলতে যায় সেই দিনই সে জানতে পারে তাঁর স্বামী কান্সারে আক্রান্ত। এই অবস্থায় সোহিনী কি করবে। সে কি তাঁর স্বামীকে সব জানাবে? জীবনের এই জটিলতা নিয়েই ছবি 'গহিন হৃদয়'। ছবির শেষভাগে সোহিনী বুঝতে পারে ওঁর হৃদয়ে কে বাস করে, ওঁর স্বামী ভাস্কর নাকি প্রেমিক অনুপম। ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন সুদীপা মুখোপাধ্যায়। একটি চরিত্রে দেখা যাবে লকেট চট্টোপাধ্যায়কে।

শব্দরূপ-৭৭১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	৩	■	৪		৫
	■	৬		৭		■	
৮	৯	■	১০			■	
১১		১২	■	১৩		■	■
■	■	১৪	১৫	■	১৬	১৭	১৮
১৯	■	২০		২১	■	২২	
	■	২৩			২৪	■	
২৫			■	২৬			

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. সত্যজিৎ রায়-এর বিখ্যাত চলচ্চিত্র, 'জয় বাবা—', ৪. পিঙ্গলবর্ণ, ৬. কোথাও আগুন লাগলে এরা ঘণ্টি বাজিয়ে ছুটে আসে, ৮. রাশিচক্রের সপ্তম রাশি, ১০. 'কালি,—, মন/লেখে তিনজন', ১১. গর্দভ, ১৩. সর্বদা, ১৪. পত্নী, ১৬. চতুর্থ পাণ্ডব, ২০. নক্ষত্র; চোখের তারা, ২২. খরগোশ, ২৩. বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর তিলক, ২৫. তত্ত্বাবধান, পালন, ২৬. লেখক।

উপর-নীচ : ১. হতবুদ্ধি, ২. শব্দ, গর্জন, ৩. থামিয়া থামিয়া চলা, গজেন্দ্রগমন, ৪. কলম রাখিবার আধার, ৫. শনির বাহন ৭. ঘড়া, গাগরা, ৯. নারীর নৃত্য, ১২. যিনি ভববন্ধন হতে ত্রাণ করেন, ১৫. বক্ষস্থল (পদ্যে), ১৭. রামচন্দ্রের পুত্র, ১৮. পদাতিক সৈন্য, ১৯. গণেশের বাহন, ২১. মধুর অস্ফুট ধ্বনি, ২৪. লিখন; চিঠি।

সমাধান
শব্দরূপ-৭৬৮
সঠিক উত্তরদাতা
সদানন্দ নন্দী
লাভপুর, বীরভূম
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

■	■	■	■	■	অ	ঙ্গ	দ
■	উ	দ্ধ	ব	■	ন্ত্যে	■	য়া
উ	■	■	স	ম	ষ্টি	■	র
ভ	গ	বা	ন	■	■	■	সা
য়	■	■	■	রা	জ	রো	গ
ভা	■	নি	দা	ঘ	■	■	র
র	■	র্ঝ	■	ব	রু	ণ	■
তী	ব	র	■	■	■	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৭৭১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১১ জানুয়ারি ২০১৬ সংখ্যায়

লেখক-লেখিকাদের প্রতি

▯ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

▯ যে কোনো রকম লেখা, তা চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন, কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন বা ফাঁক রেখে পাঠাতে হবে। অথবা টাইপ করে বা সিডি-তে পাঠালে ভালো হয়। কোনো লেখারই ফটোকপি গ্রাহ্য হবে না। লেখক বা লেখিকার নাম, পুরো ঠিকানা, ফোন নম্বর থাকা অবশ্যই দরকার এবং সংক্ষিপ্ত পরিচিতি থাকা বাঞ্ছনীয়। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।

▯ চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের উপর 'চিঠিপত্র' কথাটি অবশ্যই লিখবেন। 'চিঠিপত্র' **১৫০টি** শব্দের মধ্যে হতে হবে। একই কথা প্রযোজ্য শব্দছকের ক্ষেত্রে। খামের উপর 'শব্দরূপ' লিখতে হবে।

▯ ভ্রমণ বিষয়ক লেখার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি (ফটো প্রিন্ট) পাঠানো বাঞ্ছনীয়। অন্যান্য ধরনের লেখার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় ছবি পাঠানো যেতে পারে।

▯ পূর্বে প্রকাশিত কোনো লেখা গ্রাহ্য হয় না। পুনঃ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগই লেখা নির্বাচন করে থাকে।

▯ গ্রন্থ-সমালোচনার জন্য দু'টি বই পাঠাবেন।

▯ স্বস্তিকায় প্রদত্ত লেখা অন্যত্র পাঠানো অনুচিত। এক বছরের মধ্যে লেখা প্রকাশিত না হলে আমাদের জানিয়ে অন্যত্র পাঠানো যেতে পারে।

▯ লেখার মধ্যে কোনো উদ্ধৃতি থাকলে তার সূত্র অর্থাৎ গ্রন্থের নাম, গ্রন্থকার, প্রকাশক, সংস্করণ, পৃষ্ঠা ইত্যাদি পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন।

▯ রচনা মনোনয়ন ও প্রকাশনার ব্যাপারে (পরিবর্তিত/ পরিমার্জিত) সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

▯ লেখার সঙ্গে মূল্যবান নথিপত্র থাকলে তা লেখক-লেখিকারা নিজ উদ্যোগে ফিরিয়ে নেবেন।

॥ জয় গোমাতা ॥ ॥ জয় গোপাল ॥

গোকৃপা মহোৎসব

উপলক্ষ্যে **মনুহার যাত্রা**

গোবৎস শ্রী রাধাকৃষ্ণজী মহারাজের

উপস্থিতিতে

এক সন্ধ্যা, গোমাতার নামে

গোভক্তির ভাবনায় ভরা সংগীতময় সৎসংগ,
গো মহিমা প্রদর্শনী, পঞ্চগব্য উৎপাদের প্রচার-প্রসার,
বিশাল গোভক্ত সম্মেলন এবং গো সেবা সম্মান

তারিখ :
রবিবার 20 ডিসেম্বর 2015
(৩রা পৌষ, সাল ১৪২২)
দূপূর ২টো থেকে

স্থান :
বিধান শিশু উদ্যান, কাকূড়গাছি
(E.S.I. হাসপাতালের কাছে)
কোলকাতা

আপনিও সপরিবারে সাদর আমন্ত্রিত।

গোসেবা পরিবার

১৫৩ এ, মুক্তারাম বাবূ স্টীট কোল-৭, ফোন: 8100 3300 44
E-mail: gosevaparivar@gmail.com | www.gosevaparivar.org

G. GROUP | MACHO | srijan Building Tomorrows | Mustard Oil & Oil Cake — Khatu Naresh Oils (P) Ltd.

পরিচ্ছন্ন পরিবেশ মৌলিক অধিকারের অঙ্গ : টি এস ঠাকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকার দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুর মানবাধিকার সংক্রান্ত আলোচনার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণ নিয়েও বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, ''পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিবেশ হলো মৌলিক অধিকারের একটি অঙ্গ।'' সুপ্রিম কোর্ট একে 'জীবনের অধিকার' বলেও স্বীকৃতি দিয়েছে। ''...তাই কেউ যদি পরিবেশ দূষিত করে, তবে সে শুধুমাত্র পরিবেশ রক্ষা আইনই ভঙ্গ করবে না, অন্যের অধিকারও ভঙ্গ করবে।'' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তিনি এমন সময়ে এই মন্তব্য করলেন যখন পরিবেশ নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা চলছে এবং সুপ্রিম কোর্ট ডিজেল চালিত গাড়ি পরীক্ষামূলকভাবে বন্ধ করার বিষয়ে সম্মতি জানিয়েছে। মানবাধিকার সম্পর্কে প্রধান বিচারপতির বক্তব্য— ''...যেকোনো কিছু যা ক্ষতিকর নয় এবং আনন্দও দান করে তাকেই মানবাধিকাররূপে গণ্য করা উচিত।'' এছাড়া দিল্লী মেট্রোপলিটন নগর হওয়া সত্ত্বেও সেখানে রাজ্য মানবাধিকার কমিশন না থাকায়, তা নিয়ে অসন্তোষ ব্যক্ত করেন। এই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রাক্তন বিচারপতিগণ, বহু কূটনীতিজ্ঞ, বিভিন্ন রাজ্যের মানবাধিকার কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা এবং সমাজের অন্যান্য অংশের বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

'বিল্লদাকুঞ্জ'
কালিকাপুর, বোলপুর,
জেলা : বীরভূম
ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭
মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

জিহাদি শিক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রাপ্ত সূত্র অনুযায়ী কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানিয়েছে, পশ্চিমবঙ্গ ও অসমের মাদ্রাসাগুলিতে জিহাদি শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। ওই সমস্ত মাদ্রাসাগুলিতে বিদেশি অর্থাৎ বাংলাদেশি শিক্ষকরা নিয়মিতই আসেন। বিশেষ করে খারিজি মাদ্রাসাগুলির উপর গোয়েন্দা নজরদারি রয়েছে বলে ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে আনুমানিক হিসাব অনুযায়ী গোটা দেশে ৩৫ হাজার মাদ্রাসা রয়েছে। প্রায় ১৫ লক্ষ পড়ুয়া রয়েছে সেখানে।

পঞ্চায়েত প্রার্থীর যোগ্যতা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সম্প্রতি হরিয়ানা রাজ্যে একটি আইন পাশ হয়েছে যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হতে হলে ন্যূনতম (দশম শ্রেণী) শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকতেই হবে। এই আইনের বিরোধিতা করে মামলা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। আইনটির বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, হরিয়ানা সরকারের আইনটি ভীষণভাবে নায্য, কেননা শিক্ষাগত যোগ্যতা একটি প্রয়োজনীয় গুণ যা জনপ্রতিনিধিত্বের অধিকারের ভিত্তিটি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তৈরি করে দেয়। এই প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের আরও স্পষ্ট বক্তব্য— কোনটি ঠিক বা ভুল তা বোঝবার জন্যও শিক্ষালাভ জরুরি।

ধর্ম ও গণতন্ত্র একসঙ্গে চলতে পারে না : মৌলানা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ পাকিস্তানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় সংস্থা কাউন্সিল অফ ইসলামিক ইডিওলজি (সি আই আই) আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে একটি প্রশ্নের উত্তরে জানিয়েছে--- ইসলাম আর গণতন্ত্র পাশাপাশি চলতে পারে না। কাউন্সিলের চেয়ারপার্সন মৌলানা মহম্মদ খান বলেন, ''কেউ সমাজতন্ত্রের নামে, কেউ জাতীয়তাবাদের নামে ভোট ভিক্ষা করেন। এর মধ্যে ইসলামের কোনো নামগন্ধ নেই। ধর্ম কখনও গণতন্ত্রের সঙ্গে চলতে পারে না।'' এই কাউন্সিল সহ-শিক্ষার বিরোধিতাও করেছে। তবে এর পাশাপাশি জানিয়েছে, ''মুখ এবং হাতের কব্জি এবং পা ঢেকে রাখা মুসলমান মহিলাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে যদি কোনো নষ্টামির সম্ভাবনা থাকে, তখন সেক্ষেত্রে মহিলাদের মুখ, হাত ও পা ঢেকে রাখা বাধ্যতামূলক।'' এই সভায় উপস্থিত জামাত-ই-ইসলামি পার্টির কট্টরপন্থী নেত্রী রাহিল কাজী মৌলানার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানালেও নিজে সম্পূর্ণ মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করেই কনফারেন্সের উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৭৩ সালের সংবিধান অনুসারে পাকিস্তানি আইনকে ইসলামিকরণের উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অতীতে এই সংস্থাটি বহু বিতর্কিতমূলক কথা বলেছিল। এমনকী বয়ঃসন্ধিকালে পৌঁছোনো মাত্রই যেকোনো বয়সের বাচ্চাকে বিয়ে দেওয়া যেতে পারে বলেও মত প্রকাশ করেছিল।

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
21 December - 2015 - Rs. 10.00

SURYA
Energising Lifestyles

WHY SURYA LED ?

The Next-Gen Surya LED lighting provides many advantages in terms of

- Eco Friendly
- Instant Lighting
- Low Maintenance
- High Energy Efficiency
- High Power Factor
- Lasts upto 25000 hrs
- Wide Operating Voltage Range*

WARRANTY 2 YEAR WARRANTY
ON ALL LED PRODUCTS

5W MRP ₹350/-

www.surya.co.in

*voltage range 100V - 300V

SURYA ROSHNI LIMITED
Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi - 110008 (INDIA) Tel : +91-11-47108000, 25810093-96,
Fax : +91-11-25789560 E-mail : consumercare@sroshni.com
Call Toll Free No. : 1800-102-5657 Join us on facebook at www.facebook.com/suryaroshni and share your thoughts!